এক প্রহরের খেলা

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

অমর সাহিত্য প্রকাশন
৭ টেমার লেন, কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৩৭১

প্রকাশক :
মণীশচন্দ্র চক্রবর্তী
অমর সাহিত্য প্রকাশন
৭ টেমার লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর :
সূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস
৩০ বিধান সরণী
কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদ-শিল্পী :
শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়

সৈয়দ মুজতবা আলী

শ্রদ্ধাস্পদেষু

কয়েকটি কথা

এই উপন্যাসটি যখন সাময়িক পত্রে প্রথম প্রকাশিত হয়—তখন এর মূল কাহিনীর ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন ক'রে কয়েকজন চিঠি লেখেন। ভবিষ্যতেও এ ধরনের প্রশ্ন পাঠকদের মনে উঠতে পারে ভেবে এখানে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন বোধ করছি। জাহান্‌-আরার দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়ে তাঁর ভ্রাতারা যখন দিল্লীতে সমবেত হন—তখন অকস্মাৎ বাদশার আদেশে আওরঙ্গজেবের দরবারে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়, এবং তাঁর পদ ও পদবী কেড়ে নিয়ে আনুষঙ্গিক ভাতা প্রভৃতি বন্ধ করে দেওয়া হয়। আবার কিছুকাল পরে জাহান্‌-আরার মধ্যস্থতায় তাঁর পূর্ব-মর্যাদা, পদ ও ভাতা-মাসোহারা ফিরে পান। বাদশার এই আপাত-দুর্বোধ্য আচরণের কারণ সম্বন্ধে বহু ঐতিহাসিকের বহু মত—কিন্তু সে সব কারণ, ঠিক অসম্ভব না হ'লেও অনেকটা অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। এর মধ্যে অর্ধ-ঐতিহাসিক বলে অভিহিত 'হামিদ-উদ্‌দীন খান নিমচা'র কাহিনীটিকে অনেকে গাল-গল্প বলে উড়িয়ে দিলেও—আমার কাছে অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়েছে। বিশেষত তাঁর রচিত ইতিহাস আওরঙ্গজেবের জীবদ্দশাতেই প্রকাশিত হয়েছে—সম্পূর্ণ মিথ্যা হলে কি আর কোন প্রতিবাদ উঠত না কোথাও থেকে? যাই হোক, সেইটুকু সূত্র অবলম্বন ক'রেই বর্তমান উপন্যাসের গ্রন্থনা, এবং বলা বাহুল্য—এর অধিকাংশ উপাদানই কাল্পনিক। তাই, একে ঐতিহাসিক উপন্যাস না ভেবে ইতিহাসের পৃষ্ঠপটে রচিত কাল্পনিক কাহিনী মনে করলেই সুখী হব। এই উপন্যাসের রচনা ও পরিকল্পনা প্রসঙ্গে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে দুটি নাম যুক্ত করতে চাই, প্রখ্যাত সাহিত্যিক অনুজোপম শ্রীমান আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও পরম স্নেহভাজন শ্রীমান মণীশ চক্রবর্তী। ইতি—

লেখক-পরিচিতি

পশ্চাতের মিলিয়ে যাওয়া অতীতের দিকে ফিরে তাকাই।...আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের কথা। ১৯০৯ সন, কার্তিক মাসের একটি দিন। একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হল, বাড়ির লোকেরা জানলেন না,—বাংলা সাহিত্যের কথাশিল্পীদের নামের তালিকায় আর-একটি নাম যুক্ত হল। অভিভাবকেরা এই শিশুটির নামকরণ করেছিলেন—গজেন্দ্রকুমার মিত্র।

আবার অতীতের দিকে ফিরে চাই।...“বাবার কথা ঠিক মনে পড়ে না। তিন বছর যখন বয়স তখন বাবা মারা গেলেন। মা ও তিন ভাই—চলে যেতে হল কাশীতে। কাশীতেই প্রথম পাঠজীবন শুরু হল।”

ইংরেজিতে প্রবাদ আছে—‘মর্নিং শোজ্ দি ডে’। সকাল দেখেই বোঝা যায়, সারা দিনটা কেমন যাবে। একথা বোধ করি জীবনের সকল ক্ষেত্রেই সত্য—সাহিত্যিক শিল্পী সকলের ক্ষেত্রেই। গজেন্দ্রকুমারের বেলাতেও একথা খাটে। কাশীর ছাত্রজীবনের কথা—তাঁর বয়সী সব ছেলেরা স্কুলের ছুটির পর যখন খেলাধুলো করে বেড়াত, তিনি তখন স্কুল-ফেরত বাড়ি গিয়েই প্রায়ান্ধকার ঘরের কোণে বইয়ের উপরই আবার উপুড় হয়ে পড়তেন। অবশ্যই সে বই স্কুলের পাঠ্য বই নয়—অ-পাঠ্য বই, সে বই সাধারণত হত গল্প-উপন্যাস, পুরাণ-উপকথা বা দেশ-দেশান্তরের অলীক কাহিনীর সংকলন,—যে বইয়ে আছে—সংকীর্ণ বাস্তব পৃথিবীর সীমা ছাড়িয়ে, বালক-মনে অধিষ্ঠিত এক বিরাট কল্প-রাজ্যের আভাস। পাঠ্য বইয়ের চাইতে, এমন কি কিশোর বয়সের অতিপ্রিয় ঘুড়ি ওড়ানো, লাট্টু ঘোরানো, গুলি খেলা—এ সকলের চাইতে অনেক অনেক বেশী আকর্ষণ ছিল গজেন্দ্রকুমারের এই পাঠ্যতালিকা-বহির্ভূত কাহিনীপাঠে। আমরা যে সময়ের কথা বলছি—তখন তাঁর বয়স সাত-আট বছর। একটি কথা আগে বলা হয় নি গজেন্দ্রকুমার ভাইদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ।

বর্ণপরিচয়ের দ্বিতীয় ভাগ সম্পূর্ণ শেষ হবার আগেই হাতের কাছে মহাভারত এসে পড়ল। গজেন্দ্রকুমার মহাভারত পড়তে শুরু করলেন। দ্বিতীয় ভাগ পাঠ শেষ হল। সঙ্গে সঙ্গে মহাভারতও। কিন্তু মহাভারতের বিরাট কাহিনীর ছাপ বালক-মনে স্থায়ী আসন গেড়ে বসল। তার পর যখনই হাতের কাছে আবারও মহাভারতখানি পেয়েছেন, টেনে নিয়েছেন, আবার পড়েছেন

আদ্যোপান্ত। আজ তাঁর পরিণত মনের ওপর, এখনও পর্যন্ত মহাভারতের প্রভাব অসীম!

মহাভারত-পাঠের পর বালক গজেন্দ্রকুমার আর-একটি দুঃসাহসিক কাজ করলেন। দ্বিতীয় ভাগ তখন সবে শেষ হয়েছে। বাড়িতে 'ভারতবর্ষ' আসে। 'ভারতবর্ষে' তখন ৺অনুরূপা দেবীর 'মহানিশা' ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছে. 'মহানিশা'র পাতাগুলিতে ছবি থাকত। সম্ভবত সেই ছবিগুলিতেই প্রথম আকৃষ্ট হয় বালক-মন। ছবি দেখার পর বালক গজেন্দ্রকুমার বানান করে করে উপন্যাসখানিও পড়তে শুরু করলেন—সেই সংখ্যা, তারও পরের সংখ্যা—গজেন্দ্রকুমার সাহিত্যের রসে তন্ময় হয়ে গেলেন। তার পরই সন্ধান শুরু হয়ে গেল সাহিত্যের ভাণ্ডারে। বাড়িতে বইয়ের অভাব ছিল না। মা ও দাদারা সবাই ছিলেন সাহিত্যরসিক। যেখানে যে বইয়ে যতটুকু কাহিনীর রস আছে, গজেন্দ্রকুমার সাগ্রহে পড়তে শুরু করেন। সেই রসনিষেকে, হয়তো গজেন্দ্রকুমার নিজেও জানতে পারলেন না, ভবিষ্যৎ কথাশিল্পীর বনেদ আরও শক্ত, আরও মজবুত হতে থাকল।

ছেলেবেলার এই সময়কার একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। কাশীর অ্যাংলো বেঙ্গলী স্কুলে (এখানেই গজেন্দ্রকুমার পড়তেন) তখন ক্লাস-টীচারই মাইনে নিতেন—মাইনে নেওয়ার সময়ে ভারি গোলমাল হত। সেই গোলমাল থামাতে একদিন মাষ্টার মশায় আহ্বান করেন, 'কে গল্প বলতে পারে!' সে ডাকে গজেন্দ্রকুমারই সর্বাগ্রে সাড়া দেন এবং সত্যি সত্যিই গল্প বলে এক ক্লাস ছেলের কোলাহল থামিয়ে দিতে সক্ষম হন। তার পর থেকে এই দিনটি এলেই তাঁর ডাক পড়ত এবং তিনিও সানন্দে এই কাজে এগিয়ে যেতেন। লক্ষণীয় এই যে—যদিও পড়া বইয়ের গল্পই বলতেন, কিন্তু কখনও নির্ভেজাল বলতেন না—তার সঙ্গে নিজের কল্পনাও কিছু যোগ করে দিতেন।

তিনি যখন ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র, তখনই হাতে-লেখা কাগজ বার করেন নিজের ক্লাস থেকে। তাঁর সঙ্গে সহযোগী সম্পাদক ছিলেন বর্তমান ভারতের ডিরেক্টার-জেনারেল অফ আর্কিওলজি—শ্রীঅমলানন্দ ঘোষ। কাশীর কিশোর বন্ধুদের মধ্যে আজও অনেকের সঙ্গেই তাঁর সংযোগ আছে। শৈশবের কাশী, কৈশোরের কাশীর সঙ্গে গজেন্দ্রকুমারের বন্ধন অচ্ছেদ্য। সময় ও সুযোগ পেলেই তিনি কাশীতে গিয়ে কিছু দিন কাটিয়ে আসেন। কাশীর গঙ্গার ঘাট, কাশীর বাঙ্গালীটোলার গলি হয়তো ক্ষণকালের জন্য তাঁকে শৈশবের স্বপ্নজাল-বোনা

অতীতের দিনগুলিতে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে তাঁর কাশীর আর এক ভ্রাতৃপ্রতিম বন্ধুর নাম উল্লেখ করা উচিত—তিনি শ্রীফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই সময়ে তাঁর মার শরীর খুব খারাপ হয়ে পড়ে। তাঁর স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য ,জন্দ্রকুমারের পড়াশুনোয় সাময়িক ছেদ পড়ে। অবশেষে কলকাতায় এসে স্থায়িভাবে বসার পর আবার পড়াশুনো শুরু হয়। বালিগঞ্জে জগদ্বন্ধু ইন্স্টিটিউশনে তিনি ভর্তি হন। এখানে যাঁদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব গাঢ় হয়, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন—শ্রীসুমথনাথ ঘোষ। সাহিত্যচর্চা ও সাহিত্যপাঠের মধ্য দিয়েই তাঁদের ভিতরে বন্ধুত্বের ভিত্তিপত্তন এবং সে বন্ধন আজও অটুট আছে। সুমথবাবু ও তিনি—দু জনে মিলেই তাঁদের প্রকাশন ব্যবসা গড়ে তুলেছেন।··· জগদ্বন্ধু ইন্স্টিটিউশন থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মেজদা ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র। বিজ্ঞানের বিষয় তাঁর কাছে বড় প্রিয়। অতএব তিনি ছোট ভাইকেও সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি করে দিলেন। কিন্তু সাহিত্যরস-উৎসের সন্ধান একবার যে পেয়েছে, বিজ্ঞানে তার মন বসবে কেন! বিজ্ঞানের ক্লাসে লুকিয়ে সাহিত্য ও ইতিহাস-পাঠ চলতে লাগল। ফলও ফলল। পড়াশুনোয় ছেদ পড়ল অকালে। স্কুল ও কলেজের পড়াশুনার মাঝে মাঝে সাহিত্যচর্চা চলছিল। এখন থেকে সাহিত্যচর্চা শুরু হল পুরোদমে।

অধিকাংশ কথাসাহিত্যিকের জীবনে দেখা যায়, তাঁরা প্রথম কবিতা লিখেছেন, তার পর গল্পরচনায় নেমেছেন। গজেন্দ্রকুমার এদিক দিয়ে ব্যতিক্রম। তাঁর প্রথম রচনাই গল্পরচনা। পরবর্তী কালে অবশ্য কিছু কবিতা লিখেছেন—তবে তা নিতান্তই নগণ্য।

প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় 'ঋত্বিক' কাগজে—সম্পাদক স্বর্গত কেশব সেন হাতে-লেখা কাগজে লেখা পড়ে খোঁজ করে চেয়ে নিয়ে এই লেখাটি ছাপান। এই লেখা ছাপা হয় ১৯২৮ সনে। প্রথম বেনামীতে ফরমায়েসী বই লিখে কিছু টাকা পান—সেও ঐ বছরে। অবশ্য প্রতিশ্রুত টাকার সবটা পান নি। সে যুগে সব লেখককেই এই কৃচ্ছ্র সাধন করতে হয়েছে।

স্বনামে লেখার জন্য প্রথম টাকা পান কয়েকটি ছেলেদের নাটক লিখে। এর পর থেকেই পত্র-পত্রিকায় অজস্র গল্প বেরোতে থাকে। এই সময়ে যাঁরা তাঁকে আনুকূল্য করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অধুনালুপ্ত 'নাচঘর' পত্রিকার সম্পাদক খ্যাতিমান সাহিত্যিক হেমেন্দ্রকুমার রায় অন্যতম।

সময় যায়। তরুণ কথাশিল্পীর খ্যাতি প্রসার লাভ করতে থাকে। আনন্দবাজার পত্রিকার তরফ থেকে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় একটি বিশেষ সংখ্যার জন্য লেখা চেয়ে পাঠান। আনন্দবাজার থেকে লেখার জন্যে সাতটি টাকা মিলল। সাহিত্যিকদের সে দুরবস্থার দিনে পত্র-পত্রিকায় লিখে টাকা পাওয়া এক মহা সৌভাগ্যের বিষয় ছিল।

এর মধ্যে সংসারের চাপও এসে পড়ে গজেন্দ্রকুমারের ওপর,—সরকারী সওদাগরী আফিসের চাকরিতে লাগিয়ে দেবার চেষ্টাও অভিভাবকদের তরফ থেকে করা হয়। সে চাকরি নিলে যে তাঁর সাহিত্যজীবনের গতি বন্ধ না হোক, অন্তত শ্লথ হয়ে যাবে, সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। সে চাকরি এড়াতে তাঁকে খুবই বেগ পেতে হয়েছিল। সংসারের ভার লাঘবের জন্যে অবশেষে তিনি বাংলা বই নিয়ে বেরিয়ে পড়েন বাংলার জেলায় জেলায়, এবং বাংলার বাইরেও—কমিশন লাভে বই বিক্রি করতে। এবিষয়ে প্রথম হাতেখড়ি হয় অবশ্য 'বুক কোম্পানি'তে সাময়িক চাকরি করে। এ চাকরি ছিল স্কুলের বই নিয়ে বাইরে বাইরে ঘোরায়—এবং এর স্থায়িত্ব হল বছরে তিন সপ্তাহ থেকে এক মাস সময়।

এই ভাবে বই ফিরি করতে করতেই নিজস্ব প্রকাশনার ইচ্ছে হয়—এবং ১৯৩৪ সনে প্রথম বই প্রকাশ করেন। একটি পয়সা মূলধন কেউ দেয় নি—তাঁকে বা তাঁর অংশীদার বন্ধু সুমথবাবুকে। পর পর ৫।৬ খানি বই প্রকাশ করার পর ১৯৩৬ সনে 'মিত্র ও ঘোষ' নামে নিজেদের প্রতিষ্ঠান করেন।

১৯৩৪ সন থেকে নিজেরা প্রকাশনার ব্যবসায় শুরু করলেও—এবং ইতিমধ্যে অন্তত দু শ গল্প ও আরও দু শ বিভিন্ন রচনা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও—প্রথম ছোটগল্পের বই 'স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্' প্রকাশ করেন ১৯৩৯ সনে। হয়তো সেই জন্যই, অপেক্ষাকৃত পরিণত রচনা থেকে বেছে নেওয়াতেই, এই বইটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্বজ্জন সমাজ থেকে অভূতপূর্ব অভিনন্দন লাভ করে। এঁর প্রথম দুটি উপন্যাস 'মনে ছিল আশা' ও 'পুরুষ ও রমণী' দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। ১৯৪০ সনেই এঁর 'রজনীগন্ধা' নামে গল্পটি 'কঙ্কণ' নামে বিখ্যাত হিন্দী চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়। স্কুল সম্বন্ধে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা থেকে এঁর সার্থক উপন্যাস 'রাত্রির তপস্যা'র সৃষ্টি। এ বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় মাসিক বসুমতীতে; 'রাত্রির তপস্যা'ও পরে চিত্রায়িত হয় এবং এর চিত্ররূপও প্রচুর খ্যাতি লাভ করে।

গজেন্দ্রকুমার স্বনামে ও বেনামে বহু পাঠ্যপুস্তকও রচনা করেছেন। এঁর স্বনামে প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা সত্তরেরও উপর। ইতিহাসে এঁর অসাধারণ অনুরাগ এবং তার ফলেই কয়েকটি সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছেন। এঁর আটটি ঐতিহাসিক উপন্যাস—বহ্নিবন্যা, সোহাগপুরা, আকাশলিপি, সুপ্তিসাগর, নারী ও নিয়তি, দহন ও দীপ্তি, রক্তকমল, একদা কী করিয়া, এক প্রহরের খেলা পাঠকসমাজে বিপুল আদৃত হয়েছে। মোগল সাম্রাজ্যের শেষ সময়ের পটভূমিকায় লিখিত 'সোহাগপুরা' ও সিপাহী-বিদ্রোহের পৃষ্ঠপটে লিখিত 'বহ্নিবন্যা'-এই উপন্যাস দুটি বহুল পরিমাণে প্রসিদ্ধি ও গুণীজনের প্রশংসা লাভ করেছে। 'কলকাতার কাছেই' 'উপকণ্ঠে' 'পৌষ-ফাগুনের পালা'—বিগত শতকের পটভূমিকায় একটি বিচিত্র পরিবারকে কেন্দ্র করে লিখিত এই ট্রিলজি এখনও পর্যন্ত গজেন্দ্রকুমারের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি। এর মধ্যে 'কলকাতার কাছেই' ১৯৫৯ সালে আকাদেমি পুরস্কারে ও 'পৌষ-ফাগুনের পালা' ১৯৬৫ সালে রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত হয়।

—এই লেখকের—

কলকাতার কাছেই
উপকণ্ঠে
পৌষ-ফাগুনের পালা
জন্মেছি এই দেশে
জীবন আরও বড
মনে ছিল আশা
নারী ও নিয়তি
দহন ও দীপ্তি
রাত্রির তপস্যা
পুরুষ ও রমণী
ভাড়াটে বাড়ি
আকাশলিপি
স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্
কঠিন-মায়া
কেতকী-বন
সোহাগপুরা
রূপতরঙ্গিমা
প্রভাত-সূর্য
জীবন-স্বপ্ন
রজনীগন্ধা
মালাচন্দন
জ্যোতিষী
আবছায়া
মিলনান্ত
প্রেরণা
নববধূ
ত্রুটি

স্বপ্নসন্ধ্যা
নীলকণ্ঠী
বহ্নিবন্যা
শ্রেষ্ঠগল্প
সমারোহ
চাঁদমালা
কোলাহল
রক্তকমল
দেহ-দেউল
সুপ্তিসাগর
বাহির-বিশ্ব
স্মরণীয় দিন
গল্পপঞ্চাশৎ
একদা কী করিয়া
রাত্রির সীমানা
জায়া নয় দয়িতা

এক প্রহরের খেলা

পুরাবৃত্তিকা

সেদিন শহর আগ্রার এক নবনির্মিত আপাতসুষুপ্ত প্রাসাদের এক প্রান্তে এক নির্জন কক্ষে একটি কিশোরী বাঁদী বহু রাত্রি পর্যন্ত জেগে বসে ছিল।

অথচ তার শুভ্র সুকোমল শয্যা প্রস্তুত ; ঘরের এক কোণে রাখা নীলাভ কাঁচের পাত্রে সুগন্ধি তেলের শেজ, তার আলো ও ধোঁয়াতে রঙীন স্বপ্নের আহ্বান ; টানা-পাখায় সামান্য মৃদু বীজন ; সুরাইয়ের গায়ে জড়ানো চামেলির মালার সুগন্ধে ঘরের বাতাস ভারী—এক কথায় কক্ষটির আবহাওয়া অতি সুখকর, নিদ্রারই অনুকূল। তবু যে এত রাত্রি পর্যন্ত এ প্রাসাদের ঐ কিশোরী বাঁদীটির চোখে তন্দ্রা নামে নি—তার কারণ কি শুধুই এই জ্যৈষ্ঠের দুঃসহ গরম ? না কি ওর মালিক তথা প্রিয়তম-দয়িতের অদর্শনজনিত অসহ বিরহ ?

আগ্রা শহরের জ্যৈষ্ঠ মাস অবশ্য চিরকালই ভয়াবহ। আজ থেকে পৌনে তিনশ বছর আগে হয়ত সেখানে এতটা মরুভূমির চেহারা ছিল না, এত বিলিতি মাটির বাড়ি আর বাঁধানো সড়কও হয় নি—তবু গরম ওখানে চিরদিনই বেশী। তাপ নিবারণের যে সব ব্যবস্থা আজ সুলভ, তখনকার দিনে তা কল্পনারও অতীত ছিল। বাদশা শাহ্‌জাদা—এবং কোন কোন নবাব-ওমরাহের বাড়িতে—কিছু কিছু টানা-পাখার ব্যবস্থা হয়েছিল, সারারাত জেগে বালক ক্রীতদাস কি ক্রীতদাসীরা টানত, সাধারণ বাড়িতে দিনে একতলার ঘর ও রাত্রে ছাদ কিম্বা উঠান ছাড়া শান্তি বা স্বস্তির কোন উপায় ছিল না। তেমনি বাদশা-নবাব-ওমরার বাড়ি এই সহজ সুখটুকু সহজলভ্য ছিল না, মেয়েরা বাইরে শুতে পারত না বেপর্দা হবার ভয়ে ; কোন কোন বড় বাড়ির ছাদে অবশ্য মেয়েদের জন্যে একাংশ ঘিরে দেওয়া হ'ত—কিন্তু শাহী হারেমে এসব ব্যবস্থা করার কথা

চিন্তাও করত না কেউ। সেখানে ইজ্জৎ বা লজ্জার চেয়েও বড় একটা কথা ছিল, নিরাপত্তা। শোনা যায় হুমায়ুঁ বাদশা পর্যন্ত নাকি চারিদিকে পাহারা রেখে বাইরে শুয়ে গেছেন—তা তাঁর তো জীবনের বেশির ভাগ মাঠে-বাটেই কেটেছে—পরবর্তীকালে আর কোন বাদশা সে সাহস করেন নি।

রীতি নেই বলেই সকলে সেই রকমে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সুতরাং ঘরের অস্বস্তিকর চাপা গরমের জন্যে মেয়েটির এই অনিদ্রা—তা মনে করার কোন কারণ নেই। বিশেষতঃ জ্যৈষ্ঠ মাসে এদেশে বাইরে শোয়াও খুব আরামপ্রদ নয়, রাত্রির তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত বাতাস উত্তপ্ত হয়ে থাকে—অন্ধকার আকাশ থেকে মনে হয় রাশি রাশি অদৃশ্য অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছে। একেবারে শেষ রাত্রে সামান্য কিছুক্ষণের জন্য হাওয়া ঈষৎ সুখস্পর্শ বলে মনে হয়, আবহাওয়া সামান্য একটু শীতল হয়ে আসে—কিন্তু সে তো দণ্ড-কয়েকের বেশী নয়—সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সে শীতলতা, ভীরু অভিসারিকার মতোই অদৃশ্য হয়ে যায়। তার চেয়ে এই পুরু পাথরে ঢাকা ইমারতের মধ্যেকার ঘর অনেক ঠাণ্ডা, যদি বাতাসের একটু ব্যবস্থা থাকে তো বাইরের থেকে ঢের বেশী আরামদায়ক হয় এখানে শোওয়া। এ প্রাসাদের তো কথাই নেই, বলতে গেলে সদ্য-নির্মিত—বহুদিনের ভেজানো ইঁটে তৈরী ইমারতের ভিতরে বাইরে পুরু পাথর দিয়ে ঢাকা, বাইরের তাপ ভেতরে পৌঁছয় না। বাইরের গরম বাতাস আসবার পথও সঙ্কীর্ণ এসব ঘরে জানালার কোন ব্যবস্থা নেই, যা আছে তাকে সম্ভ্রম ক'রে গবাক্ষ বলা যেতে পারে হয়ত, আসলে তা ঘুলঘুলি ছাড়া কিছু নয়। সুতরাং একটু বাতাস করার ব্যবস্থা থাকলে গরম এখানে দুঃসহ বোধ হয় না।

গরমও যেমন এ অনিদ্রার কারণ নয়—তেমনি প্রিয়-বিরহও না। কারণ আজকের এ বিরহ সম্পূর্ণই মেয়েটির স্বেচ্ছাসৃষ্ট। সে-ই কৌশল ক'রে মালিকের মর্জিকে ঠেকিয়েছে। মালিক তাঁর

আগমনের ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাতে আপত্তি জানানো ঘোরতর বেয়াদবি, সে রকম দুঃসাহসের কথা ভাবতেই পারে না এরা। সুতরাং সে সম্ভাবনার পূর্বেই তাতারী প্রহরিণীকে দিয়ে খৎ পাঠিয়ে জানিয়েছে যে অসহ্য মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে সে—মালিকের হুকুম হ'লে হাকিম সাহেবের কাছ থেকে কোন দাওয়াই আনাতে পারে। বলা বাহুল্য মালিকের সে হুকুম হতে বিলম্ব হয় নি। দাওয়াই তো এসেছে, সেই সঙ্গে এসেছে এ রাত্রির মতো ছুটি। দাসী পাঠিয়ে মালিক তাঁর সস্নেহ উদ্বেগ জানিয়েছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন দাওয়াই খেয়ে সকাল ক'রে শুয়ে পড়তে। তাঁর জন্যে অপেক্ষা ক'রে না অকারণে মাথার যন্ত্রণা বাড়িয়ে ফেলে সে। সর্বাধিক রূপসী এবং সর্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠা এই বাঁদীটি সম্বন্ধে মালিকের স্নেহ ও প্রশ্রয় অত্যধিক এবং আন্তরিক, তা এ প্রাসাদের সকলেই জানে।

না, বাহ্য কারণ যেগুলো নজরে পড়ে—এই কিশোরী মেয়েটির চোখে তন্দ্রা না নামবার—তার কোনটাই এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

তবু জেগে সে আছে—এটাও ঠিক।

ঘুম আসছে না বলে হয়ত নয়, হয়ত জেগে থাকা প্রয়োজন বলেই আছে।

কারণ, বারংবার পা টিপে টিপে দরজার কাছে যাচ্ছে সে, ভারী দামাস্কের লজ্জারক্ত পর্দাটার পাশে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, কী যেন কান পেতে শোনবার চেষ্টা করছে—আবার ফিরে এসে বিছানায় বসছে। কিন্তু বেশীক্ষণ স্থির হয়ে বসতে পারছে না। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, চারপাইয়ের পাশে রাখা একটা অত্যন্ত কী অকিঞ্চিৎকর এবং এ ঘরের পক্ষে একান্ত বেমানান বস্তু নাড়াচাড়া করছে, এক একবার অন্যমনস্ক ভাবেই হাতে ক'রে ঘুরিয়ে দেখছে—আবার তা রেখে দিয়ে অস্থির ভাবে উঠে দাঁড়াচ্ছে। যেন একটা কিছুর জন্যে অপেক্ষা করছে।

কোন একটা ঘটনার অথবা কারও আগমনের।

এই ভাবেই এক সময় রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। প্রাসাদের উদ্যানে রাখা পেটা ঘড়িতে দ্বিতীয় প্রহরের ঘণ্টা বেজে গেল একে একে।

শান্ত স্তব্ধ হয়ে গেছে এ প্রাসাদের প্রাণ-চাঞ্চল্য অনেকক্ষণ আগেই। কিন্তু সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা সেটা এ স্তব্ধতা থেকে বোঝা যায় না। মালিক যখন তাঁর ঈপ্সিত কক্ষে শয়ন করতে যান, তখন থেকেই এ প্রাসাদে অনাবশ্যক শব্দ থেমে যায় একেবারে। পরিচারক পরিজনরা পা টিপে টিপে চলে, আহার করে তাও যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে। জোর বাতি সব নিভিয়ে দেওয়া হয়। ফটক-গুলোতে প্রচুর তেল দেওয়া থাকে—পাছে খুলে দেওয়ার সময় কোন ধাতব শব্দ ওঠে এই ভয়ে—তবু বড় বড় ফটকগুলো প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হবার আগেই বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এখানে গভীর রাত্রি পর্যন্ত জেগে থাকে শুধু বিরহিণী বা অভিসারিকার দল। জেগে থাকে তাদের দয়িত বা প্রেমিকরা, আর জেগে থাকে ভৃত্য কর্মচারী-প্রহরী-প্রহরিণীরা। তারাও মালিকের বিশ্রামের সময় হ'লে কাপড়ের জুতো পরে চলাফেরা করে—ভৃত্যরা খালি পায়ে। কথা কয় না কেউ, ইশারা ইঙ্গিতে কাজ সারে—নিতান্ত প্রয়োজন হ'লে চুপি চুপি ফিস ফিস করে কথা কয়। কিন্তু সেও দ্বিতীয় প্রহরের পরে আর নয়। তার মধ্যেই যে যার কাজ সেরে নিজের নিজের কোটরে গিয়ে ঢোকে—নয়ত বাগানে বা বারান্দায় চারপাই আশ্রয় করে। এর পরে জেগে থাকে কেবল তাতারী প্রহরিণীরা, হাবসী খোজারা। তাদের ঘুমোলে চলবে না। অন্ধকারে মুক্ত কৃপাণ হাতে নিঃশব্দে প্রেতমূর্তির মতো ঘুরে বেড়ায় তারা অলিন্দে অলিন্দে, উদ্যানের কোণে কোণে—ফটকের ধারে ধারে। কোন অপরাধী চোখে পড়লেও শব্দ করে না, চেঁচিয়ে ডাকে না কাউকে—হয় তাকে নিজে নিজেই গ্রেপ্তার করে, নয় তো অসুবিধা বুঝলে একেবারেই তরবারী বসিয়ে দেয় বুকে।

এ সবই জানে এই মেয়েটি—এ প্রাসাদের এই সব আইন-কানুন। বোধকরি সেই জন্যেই অপেক্ষা করছে সে—অধীর অস্থির হয়ে।

দ্বিতীয় প্রহরের ঘড়ি বাজার শব্দ এ বাড়ির খিলানে খিলানে প্রতিশব্দ জাগিয়ে মিলিয়ে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েটি যেন আশ্বস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। মন স্থির করে ফেলেছে সে আগেই। শুধু যেটুকু দ্বিধা ছিল তা যেন ঐ ঘড়ির শব্দেই দূর হয়ে গেল। বেইমান সে নয়—এটা সন্ধ্যা থেকেই বারবার বুঝিয়েছে মনকে। ব্যবহারিক অর্থে যাকে বেইমানী বলে তা হয়ত করছে সে—কিন্তু ন্যায়ধর্মের দিক থেকে বিচার করলে সে বেইমান নয়। বিবেকের কাছে সে মুক্ত, নিশ্চিন্ত। যাকে অপরাধ বলে তা কিছু করে নি সে, করছে না। বরং যার পাপ-পুণ্যের এক রকম অংশভাগিনী সে—তাঁকেই এক ঘোরতর পাপাচরণ থেকে বিরত করছে।

অবশ্য হ্যাঁ—একটু অন্যায় হয়ত হয়ে যাচ্ছে, সামান্য একটু গুনাহ্।

যার কথা ভেবে, আসলে যার মঙ্গলের জন্যে সে এই দুঃসাহসিক কাজ করতে যাচ্ছে, তার কথা হয়ত এখন আর চিন্তা করা উচিত নয় ওর।

হয়ত এটা পাপ। এর জন্য প্রত্যবায়ভাগী হ'তে হবে তাকে। ঈশ্বরের কাছে—এরা যাকে খোদা বলে তাঁর কাছে একদিন জবাবদিহি করতে হবে।

সে জানে তা, তার জন্য প্রস্তুতই আছে সে।

তবু যে এ কাজ করতে যাচ্ছে—তার কারণ সে নিরুপায়।

এই প্রশ্নটা নিয়ে আজ কদিন ধরে মনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে সে। এই পাপ-পুণ্যের প্রশ্নটা নিয়ে। ক্লান্ত, ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে—ন্যায়নীতি-বিবেকের সঙ্গে আবেগ আর প্রণয়ের এই দ্বন্দ্বে। আজ যে মাথাধরার অজুহাত দেখিয়েছে সে, সেটা খুব মিথ্যাও নয়।

শরীর সত্যই ভেঙ্গে এসেছে কদিনের এই দুঃসহ কুটিল চিন্তায়। কদিনেই যেন শীর্ণ হয়ে গিয়েছে, ম্লান হয়ে এসেছে মুখের স্বাভাবিক লাবণ্য ও স্বাস্থ্যের দীপ্তি।

অবশেষে সোজাসুজি আবেগের কাছেই আত্মসমর্পণ করেছে।

পারবে না সে—কিছুতেই স্থির থাকতে পারবে না; পারবে না আলস্য ও আরামে দিন কাটাতে—এই ভয়ঙ্কর সত্য জানবার পরও।

তার ধ্যানের দেবতা, তার অন্তরের নিভৃততম প্রদেশের একাধিপতি—সেই এক রাত্রির স্বপ্নে দেখা মানস-রাজাধিরাজের এই নিদারুণ বিপদের কথা জেনেও নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারবে না।

সে রাজাধিরাজ যে তাঁর এই দীনতমা সেবিকাকে মনে ক'রে রাখেন নি, তা ও জানে।

অসংখ্য সেবিকার মধ্যে সামান্যা এক বালিকাকে, তাও যার সঙ্গে সম্পর্ক একদিন—হয়ত বা মাত্র প্রহরকালের—মনে ক'রে রাখা সম্ভব নয়। বিশেষ তাঁর মতো কর্মব্যস্ত মানুষের। তা ছাড়াও, কোথায় তিনি আর কোথায় ও। দুস্তর ব্যবধান ওদের দুজনের জীবনে। একজন বহু লোকের দণ্ডমুণ্ডের মালিক, বহু লোকের জীবন-মরণ আশা-আকাঙ্ক্ষার সূত্র ধরে চালনা করছেন, আর একজন সামান্যা ক্রীতদাসী মাত্র। তাও তাঁর নিজের নয়—অপরের। কোন মানুষ কি তার গায়ে-উড়ে-এসে-বসা এক মুহূর্তের একটি মক্ষিকাকে স্মরণ রাখে? রাখা কি সম্ভব?

আরও কারণ আছে তাঁর মনে না থাকার।

সাধারণ মানুষও যে নন তিনি।

একদিন, মাত্র কিছুক্ষণের জন্য দেখেছে সে, হয়ত সব মিলিয়ে দুই প্রহরও নয়, তবু তাঁকে চিনেছে সে, ভাল ক'রেই চিনেছে।

আবেগ, প্রেম, দয়া, মায়া, করুণা—এসব তুচ্ছ হৃদয়-দৌর্বল্যের অনেক উর্ধ্বে তিনি। সেই জন্যেই দেবতার উপমাটা বারবার মনে আসে ওর। নির্মম, কঠিন, কোন কিছুই যেন স্পর্শ করে না তাঁকে। এ

পৃথিবীর যা কিছু বস্তু—সব তাঁর কাছে প্রয়োজনের সামগ্রী—এর চেয়ে বেশী কিছু নয়। এই হিন্দুস্তানে আসার আগে সমুদ্র পার হ'তে হয়েছে ওকে, পাহাড়ের ধারে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখেছে সে। দেখেছে সে পাথরের অদ্ভুত কাঠিন্য। সাগরের ঢেউ বারবার এসে আছড়ে পড়ছে পাহাড়ের গায়ে, কখনও মন্দবেগে, কখনও প্রবল আস্ফালনের সঙ্গে—কিন্তু ফল হচ্ছে একই, হার মেনে ফিরে যেতে হচ্ছে। না পারছে সে পাহাড়কে একবিন্দু টলাতে, না পারছে তার পাথরকে বিন্দুমাত্র আর্দ্র করতে। এ মানুষও তেমনিই—এ পৃথিবীর কোন কোমল অনুভূতিরই সাধ্য নেই যে তাঁকে দ্রবীভূত কি আর্দ্র করে, কিম্বা বিচলিত করে।

সুন্দর, অতি সুন্দর। আশ্চর্য তাঁর রূপ, তবু কি ভয়ঙ্কর। কী কাঠিন্য তাঁর শান্ত শাণিত দৃষ্টিতে। কী নির্মম ঔদাসীন্য তাঁর অত সুন্দর আয়ত চোখে—কী অপরিসীম ঔদ্ধত্য তাঁর সুপ্রশস্ত সুডৌল ললাটের কটি সূক্ষ্ম রেখায়, আর কী অবিশ্বাস্য নিষ্ঠুরতা তাঁর ওষ্ঠের ভঙ্গীতে। সেই দৃঢ়সম্বদ্ধ ওষ্ঠাধর যেন যে-কোন মুহূর্তে একটা নিষ্করুণ ব্যঙ্গে বিকৃত হয়ে উঠবে—মানুষের সমস্ত প্রচলিত ধারণা ও বিশ্বাসের প্রতি বিদ্রূপে। তাঁর সেই চোখের দিকে, চাহনির দিকে—মুখের ও মুখের সেই ঈষৎ-কৌতুক-ব্যঙ্গে-ভরা হাসির দিকে চাইলে অকারণ ও অজানা ভয়ে বুকের মধ্যে পর্যন্ত যেন হিম হয়ে যায়।

তবু তিনি সুন্দর, মনোমোহন। তিনিই ওর দয়িত।

তাঁকে ভুলতে পারে নি সেদিনের সেই শঙ্কিতা বালিকাটি আজও।

মনের নিভৃত পূজার আসনটিতে আজও নিত্য তাঁর আরতি চলছে।

তার কারণ—তিনিই ওর বালিকা বয়সের অনাঘ্রাত প্রথম প্রস্ফুট কুসুমটি গ্রহণ করেছিলেন।

না, অর্ঘ্য হিসেবে দেয় নি সে,তিনি জোর ক'রে গ্রহণ করেছিলেন ; নির্মম অবজ্ঞায়, অবহেলায়—মাত্র কয়েক খণ্ড স্বর্ণ-মুদ্রার বিনিময়ে।

নিতান্তই মুহূর্তের খেয়াল চরিতার্থ করার প্রয়োজনে লেগেছিল সে, কেনাবেচার হাটে সাধারণ পণ্য ছাড়া আর কিছু ভাবার অবসর হয় নি, অন্য কিছু ভাবার কথা সম্ভবতঃ তাঁর মনেও হয় নি।

তবু তাতেই যেন কৃতার্থ হয়ে গিয়েছিল সে।

অবাক হয়ে চেয়ে ছিল সেই স্নেহমমতাহীন পাষাণ দেবতার দিকে, যাঁর কাছে তার মতো মানুষ কীট-পতঙ্গের বেশী কিছু নয়, হয়ত ভোগের বস্তু, কিন্তু বিবেচনার যোগ্য কোন প্রাণী নয়; যার দিকে তাকাবার প্রয়োজন নেই, প্রয়োজনের শেষে যাকে অনায়াসে ঝেড়ে ফেলে দেওয়া যায়, পায়ে দলে পিষে যাওয়া যায়।

হ্যাঁ, অবাক হয়েই চেয়ে ছিল সে। দেখে যেন আশা মেটে নি, দেখার বিস্ময় শেষ হয় নি। ভয় করেছিল, খুবই ভয় করেছিল। তবে ভয়ও যত করেছিল মুগ্ধও তত হয়ছিল। ভয় করেছিল বলেই বুঝি আজও ভুলতে পারে নি, চিরদিনের মতো তাঁকেই উপাস্য ক'রে বসে আছে, কখন নিজের অজ্ঞাতসারেই দয়িতের আসনে—মালিকের আসনে বসিয়েছে।...

মন স্থির করার সঙ্গে সঙ্গেই অল্প বয়সের সক্রিয়তা ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তা ফিরে এল তার হাতে-পায়ে-মনে। উঠে দাঁড়িয়ে পাশের আলনা থেকে বোরখাটা টেনে নিয়ে সর্বাঙ্গে জড়িয়ে নিল; তারপর, পাশের চৌকিতে রাখা সেই তুচ্ছ বস্তুটা তুলে নিয়ে মুষিকের মতো দ্রুত অথচ লঘু পায়ে বেরিয়ে এল সে ঘর থেকে। আসার আগে কুলুঙ্গিতে রাখা রঙীন শেজ্এর আলোটাকে একটা হাত-পাখা দিয়ে আড়াল ক'রে রেখে এল—যাতে সামান্য আলোও না বিছানার ওপর গিয়ে পড়ে। তাতেও যেন নিশ্চিন্ত হ'তে পারল না, পর্দাটা ভাল ক'রে টেনে দিয়ে একবার বাইরে থেকে দেখে নিল—গৃহাধিকারিণীর অনুপস্থিতির কোন চিহ্ন বাইরে থেকে চোখে পড়ে কিনা।

ঘর থেকে বেরিয়ে দালানের মতো যে জায়গাটায় পড়ল

সেখানটাও একেবারে অন্ধকার নয়, বাতিদানে ঝোলানো একটি তেলের আলোর ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সেই সামান্য আলোতে অতবড় দালানে আলোর চেয়ে ছায়ারই সৃষ্টি হয় বেশী। ফলে এমনিতেই, দূরের ঘনীভূত অন্ধকারের দিকে চাইলে মনে হয় সেই আলো-আঁধারীতে ছায়ামূর্তির মতো কী যেন সব নড়ে বেড়াচ্ছে। তাই সত্যি সত্যিই যখন কেউ নড়ে—চোখে পড়লেও তত কেউ মাথা ঘামায় না। কায়াকে ছায়া মনে করে।

সেদিকে চেয়ে কিছুটা যেন আশ্বস্তই হ'ল সে গোপনচারিণী। তেমনি ত্বরিৎগতিতে দালান পেরিয়ে সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়াল একবার। কান পেতে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করল—নিচের দালানে প্রহরিণী ঠিক কোন্ দিকে আছে। নিঃশব্দ গতি তাদেরও, তবু কিছুক্ষণ সেই শব্দহীন স্তব্ধতায় কান পেতে থাকলে খানিকটা আন্দাজ করা যায়। অতি সূক্ষ্ম শব্দকেও বেছে নেওয়া যায় পরিপূর্ণ নৈঃশব্দ্য থেকে পৃথক ক'রে। বালিকাও একটু চেষ্টাতেই তফাৎটা ধরে নিল। যখন বুঝল প্রহরিণী অপর দিকের শেষ প্রান্তে গেছে, তখন নিশ্চিন্ত হয়ে নেমে গেল নিচে। সেখানেও সেই ক্ষীণ আলো, ওপরের মতোই আলো-ছায়ার খেলা। মনে পড়ল তার বোরখার রঙ কালো, ছায়াকেও ছায়া বলে হয়ত বোঝা যাবে না—যদি বা নজরে পড়েও। সে আর ইতস্ততঃ করল না, ফিরে তাকিয়ে প্রহরিণীর গতিবিধি বোঝারও চেষ্টা করল না - তেমনি ক্ষিপ্র লঘুপদে দালানের কোণের দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে একেবারে বাগানে পড়ল।

সেখানেও পাহারা আছে। প্রহরী-প্রহরিণী দু' রকমই আছে সেখানে। ফটকে আছে সান্ত্রী পাহারা। তবু বাইরে বেরিয়ে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল একটা। এখানে তার ভয় নেই তা জানে সে। এখানে আজকে যে প্রধানা প্রহরিণী সে তার দেশের লোক। বস্তুত সে তাকে ধাত্রীর মতোই মানুষ করেছে শৈশবে ও বাল্যে। তাকে কেনবার সময় মালিক ওকেও কিনে নিয়েছিলেন, সেই থেকে সঙ্গে

সঙ্গেই আছে সে। আজকের এ দুঃসাহসিক অভিযানের কথা সে জানে, এর যা কিছু বহিরঙ্গ আয়োজন বা ব্যবস্থা—সে-ই করেছে। কাছাকাছিই কোথাও আছে সে—সে ই তাকে খুঁজে নেবে।

আর খুঁজেও নিল সে। বাঁদীর অনুমান যে বেঠিক নয় তা বোঝা গেল সঙ্গে সঙ্গে। যেন প্রেতিনীর মতো অন্ধকার থেকে নিঃশব্দে আকস্মিক আবির্ভাব ঘটল সেই প্রহরিণীর। কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তা বাঁদী একটুও বুঝতে পারে নি—যদিও সে ওকেই প্রত্যাশা করছিল। একেবারে পাশে এসে বোরখার ওপর দিয়েই বাহুমূল ধরে আকর্ষণ করতে চমকে চেয়ে দেখল ও চিনতে পারল। কী ভাগ্যি যে চেঁচিয়ে ওঠে নি। তবে কিছুক্ষণের জন্যে নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হবার মতো হয়ে গিয়েছিল, ভয়ে।

প্রহরিণীর কিন্তু এসব তুচ্ছ তথ্য নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় ছিল না। সে এই বাঁদীর বাঁদী, এর আদেশই পালন করবার জন্য তার এত কাণ্ড, এত সতর্কতা—তবু তার কাছে এখন আদেশদাত্রীর চেয়ে আদেশটাই বড়। সে এক মুহূর্তও থামতে দিল না ওকে, নিঃশব্দে কনুইয়ের কাছটা ধরে একরকম টানতে টানতে নিয়ে চলল—বাগানের মধ্যকার পাথর-বাঁধানো রাস্তাগুলো ছেড়ে ঘাসের ওপর দিয়ে। অন্ধকার রাত্রি, তবু নক্ষত্রের আলো আছে; আর খুব অন্ধকারে সে আলোও বড় কম নয়—তাই সে প্রধানত গাছের তলায় তলায় গাঢ়তর অন্ধকারে আত্মগোপন ক'রে চলতে লাগল।

একেবারে পাঁচিলের কাছাকাছি এসে বুকের রক্ত আর একবার হিম হয়ে এসেছিল বাঁদীর। শুধু যে পলাতকরা গাছের ছায়া বেছে নেয় তাই তো নয়—পাহারাদাররাও চায় সেখানে লুকিয়ে থেকে গোপনচারীদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে। অকস্মাৎ এমনি একটা বড় আমগাছের ছায়ায় ওরা বর্শাধারী এক প্রহরীর সামনে পড়ে গিয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে সে ব্যক্তি চেঁচামেচি করে নি বিশেষ—মনিবের ঘুম ভাঙ্গার আশঙ্কায় চোর বলে বুঝতে পারলেও চেঁচামেচি

করে না এরা—শুধু বর্শা বাগিয়ে ধরে পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে লোকটি প্রহরিণীর পরিচিত—সে-খোঁজ নিয়েই এত নিশ্চিন্ত হয়ে আসছিল বোধহয় ও—ওকে চিনতে পারামাত্র সে আবার আগের মতোই গাঢ়তর অন্ধকারে, ঐ বিপুল অন্ধকারের খণ্ডাংশের মতো মিলিয়ে গেল কোথায়, কোন প্রশ্নমাত্র করল না।

পাঁচিলের নিচে এসে প্রথম একটু দাঁড়াল প্রহরিণী, কিন্তু সে বিশ্রামের জন্যে নয়, পার হওয়ার প্রস্তুতি হিসেবেই। অবশ্য সে বেশীক্ষণও নয়, নিজের অস্ত্রটা খাপে পুরে পিঠের দিক ক'রে বেঁধে নিয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে মেয়েটাকে দু'হাতে উঠিয়ে ওপরে তুলে দিল, তারপর নিজেও এক লাফে পাঁচিলে উঠে ওপারে নেমে পড়ল টুপ ক'রে। তারপর একেবারে এসে বাঁদীর পায়ের কাছে পাঁচিলে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল—দু'হাত বুকের ওপর জোড়বদ্ধ ক'রে। মেয়েটি বুঝতে পারল ইঙ্গিতটা, সে বিনা দ্বিধায় ওর কাঁধে ও হাতের ওপর পা দিয়ে নেমে এল।

যেখানে ওরা নামল সেটা রাস্তা নয়, পতিত জমি—কতকটা মাঠের মতো, সামান্য সামান্য ঠেঁটি ও অন্যান্য কাঁটাগুল্ম ছাড়া আর কোন গাছপালা নেই। পাঁচিল থেকে হাত ছয়েক দূরে একটা পরিখার মতোও আছে, তবে তাতে এখন জলের চিহ্নও নেই। ওরা অনায়াসে পায়ে হেঁটে পার হয়ে এল।

পরিখা পেরিয়ে দ্রুত এসে যেখানে পথে উঠল সেখানে দেখা গেল একটা গাছের ছায়ায় একটা ডুলি ও দুজন বাহক নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। প্রহরিণীর ইঙ্গিতে মেয়েটি গিয়ে সেই ডুলিতে উঠল। বাহকরাও প্রস্তুত ছিল, তারাও তৎক্ষণাৎ বিনা প্রশ্নে ডুলি কাঁধে তুলে রওনা দিল। কোথায় যাবে বা যেতে হবে—তাও প্রশ্ন করল না, সম্ভবত জানাই আছে তাদের। প্রহরিণীও পিঠে বাঁধা কোষ থেকে ছোট তলোয়ারখানা খুলে নিয়ে ডুলির পাশে পাশে চলতে শুরু করল।

অপেক্ষাকৃত জনবিরল পথ ধরে, নগরীর উপকণ্ঠ দিয়ে যাচ্ছিল ওরা, ফলে গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে বহু বিলম্ব হয়ে গেল। প্রায় চার দণ্ডকাল সময় লাগল সেই অনতিদূরত্ব অতিক্রম করতে। গরম তো আছেই অত রাত্রেও বাতাস কিছুমাত্র শীতল হয় নি—তাতে আবার পরনে দুপ্রস্থ জামা, ওড়না, বোরখা,—এর ওপর আছে ডুলির চার পাশে ভেলভেটের ঘেরাটোপ। প্রাণ কণ্ঠাগত হবার পক্ষে এই-ই যথেষ্ট কিন্তু এসব দৈহিক অস্বাচ্ছন্দ্যের থেকে ঢের বেশী অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে দুশ্চিন্তা ও আশঙ্কা। যদি কেউ রাত্রে খোঁজ করে, যদি হঠাৎ মালিকেরই খেয়াল হয় আর তার ফলে ওর এই গোপন অভিযান ধরা পড়ে তাহলে,—তাহলে যে কী হবে তা ভাবতেই পারছে না মেয়েটি। দেবার মতো কোন কৈফিয়ৎই নেই, দিতেও পারবে না। আর এই উত্তরের অভাবই ওর বিরুদ্ধে প্রধান সাক্ষ্য বলে গণ্য হবে। আর তার অবশ্যম্ভাবী ফল কী হবে তাও ওর জানা। মালিকের স্নেহভাজন হওয়ার পরও যারা কোন রকম বিশ্বাসঘাতকতা করে—বিশেষত স্ত্রীলোকরা যদি অন্য পুরুষে আসক্ত হয়—তাদের জন্য একটিই মাত্র শাস্তির ব্যবস্থা আছে—জীবন্ত সমাধি দেওয়া।...

এতক্ষণ, সেই অপরাহ্ণেরও পূর্ব থেকে—একান্ত মনে এই যাওয়ার কথাটাই ভেবেছিল, শুধু তার উপায়টাই ছিল সর্বাগ্র-চিন্তা, তাই অন্য কোন কথা, যেমন এই সব বিপদের সম্ভাবনাগুলো, ভেবে দেখার অবসর পায় নি। কিন্তু এখন ডুলিতে বসে, এতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত বাধাবিঘ্ন নিরাপদে অতিক্রম করে আসার ফলে কিছুটা নিরুদ্বিগ্ন হতে নতুন উদ্বেগ এবং দুশ্চিন্তা যেন ভীড় ক'রে এসে জুটল ওর মাথায়। অমঙ্গল বা বিপদ যা যা ঘটতে পারে তার ছবি ভয়াবহ রকমের বহুগুণ বর্ধিত আকারে ওর মানসচক্ষে ভেসে উঠতে লাগল। ঘেমে তো নেয়ে উঠেছিলই, এখন গা-মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে হল যেন—মনে হ'ল শৈশবের মতো কেঁদে পরিত্রাণ পায় সে তার অদৃষ্টের হাত থেকে।

ভয় হ'তে লাগল যে আর বেশীক্ষণ এই ভাবে বসে থকেতে হ'লে এর মধ্যেই মরে পড়ে থাকবে সে।

যাই হোক—মৃত্যু না হোক মূর্ছার বেশী বিলম্ব ছিল না হয়ত, কিন্তু সে রকম কোন চরম পরিণতির আগেই এক সময় ওরা গন্তব্য-স্থানে পৌঁছে গেল। যেখানে ডুলি থামল সেটাও একটা প্রাসাদের পিছন দিক। ওদের মালিকের বাসগৃহের মতো অত বড় না হ'লেও —এটাও যে কোন ধনীগৃহ তা বুঝতে দেরি হয় না।

ডুলিওয়ালারা ডুলি নামাতে প্রহরিণী ঘেরাটোপের দুই প্রান্ত সরিয়ে মেয়েটিকে এক রকম টেনেই বার করল ভেতর থেকে। ওর যে এইরকম একটা অবস্থা হবে, বয়স্কা প্রহরিণী আগেই অনুমান করেছিল তা। শেষের দিকটা মূর্ছিত বিহ্বলের মতো বসে ছিল মেয়েটি, কোথায় যাচ্ছে, কী কাজে, তাও যেন আর মাথাতে ঢুকছিল না। চিন্তা করার শক্তি এমন কি বাহ্য-অনুভূতিই যেন লোপ পেয়ে এসেছিল একটু একটু ক'রে। কাজেই মাটিতে নেমেও, দাঁড়াবার ক্ষমতা ফিরে পেতে সময় লাগল। হয়ত পড়েই যেত—প্রহরিণী অবস্থা বুঝে এক হাতে জড়িয়ে ধরে সম্পূর্ণ ওর ভারটা নিজের ওপর রাখাতেই সেটা হ'তে পারল না।

অবশ্য বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস, পায়ের নিচে কঠিন মাটি এবং প্রহরিণীর বলিষ্ঠ হাতের পরুষ স্পর্শে সম্বিৎ ফিরে পেতে বিলম্ব হ'ল না। সূক্ষ্ম মসলিনের রুমালখানা কামিজের জেব থেকে বার করে সে কপালের ও চোখের-খাঁজে-জমে-থাকা ঘাম মুছে নিয়ে বোরখাটা ভাল ক'রে জড়িয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল! এবার কিন্তু আর পাঁচিলের দিকে নয়, সোজাসুজি সামনের বড় ফটকের দিকেই।

ফটক তখন বন্ধ, অতরাত্রে বন্ধ থাকবারই তো কথা– মেয়েটিও তা জানে। কিন্তু এও জানে যে অন্তত দু'জন পাহারাদার ঐ ফটকের ভেতর দিকে থাকবে, ফটকের পাহারা এসব বাড়িতে দিন-রাতই

থাকে—আর মানুষের সাড়া পেলে কি মানুষ আসতে দেখলে তারাও এগিয়ে আসবে সামনের দিকে। তবে ফটক ভেতর থেকেই বন্ধ যখন তখন হঠাৎ কেউ তাকে আক্রমণ করবে না।

দেখা গেল এ বাড়ির পাহারার ব্যবস্থা ভাল, প্রহরীরা শুধু সজাগ নয়, সদাসতর্ক। ফটকের সামনে পাথর-বাঁধানো প্রশস্ত রাস্তায় ওদের খালি পায়ের সামান্য শব্দ ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ফটকের দুটি বড় থামের আড়াল থেকে দু'জন পাহারাদার যেন অন্ধকার শূন্যতা থেকে কোন জাদুবলে মূর্তি পরিগ্রহ ক'রে বেরিয়ে এল এবং ফটকের ভেতর থেকে বন্দুকের নল বার ক'রে চাপা অথচ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'কে আসে ওখানে? দাঁড়াও, জবাব দাও, নইলে খত্‌রা ঘটবে।'

'দোস্ত্‌ আমরা' মেয়েটি কোন কথা বলার আগেই প্রহরিণী ওদের মতোই চাপা গলায় বলে উঠল।

'দোস্ত্‌! জেনানী দোস্ত্‌! তওবা, তওবা!' একজন পাহারাওয়ালা ওরই মধ্যে রসিকতার লোভ সামলাতে পারল না, 'কী রকম দোস্ত্‌ তোমরা? উমর কতো? কার সঙ্গে দোস্তী করতে এসেছ? না কি দু'জনের সঙ্গেই?'

'দিল্লগী থাক।' প্রহরিণী তেমনি চাপা গলাতেই ধমক দেয়, 'আমরা তোমাদের সঙ্গে মস্করা করতে আসি নি। কাজ আছে আমাদের, জরুরী কাজ?'

'কাজ!' ভ্রূকুটি ক'রে বলল প্রহরী, 'কাজ মানে কি? কী কাজ, কাকে দরকার?'

'দরকার তোমাদের মালিককে। তোমাদের মতো পাহারাদারের সঙ্গে আমাদের দরকার থাকতে পারে না—এটা বোঝা উচিত।'

'বাহবা বা। বিবিজী বেশ দেলোয়ার আওরৎ বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু কী দরের মানুষ তোমরা তা এই আঁধেরাতে কী ক'রে বুঝব বলো, বিশেষ এই সামনে যিনি তিনি তো বোরখায় সর্বাঙ্গ ঢেকে

এসেছেন ; তা যাক গে মরুক গে—যদি অপরাধ হয়ে থাকে তো ক্ষ্যামাঘেন্না ক'রে মানিয়ে নিও। এখন কাজটা কি বলো দিকি ? যদি সত্যিই কোনো কাজের কথা থাকে তো বলো, নইলে চটপট সরে পড়ো।'

'কাজ তো বললুম—তোমাদের মনিবের সঙ্গে।'

'বা জী বা ! আমাদের মালিক কি মোড়ের ঐ তামাকুর দোকানের হবিব মিয়া যে—যে-কেউ ডাকবে ঝাঁপ খুলে শশব্যস্তে বেরিয়ে আসবে ? এখন ক' ঘড়ি বেজেছে তা খেয়াল আছে ? এমন কে মেহমান তোমরা আসছ যে মালিক তোমাদের জন্যে জেগে বসে থাকবেন ? ওসব ছাড়ো, মানে মানে সরে পড়ো। তুপুর রাতে এ সব তামাশা ভাল লাগছে না !'

'এসব তামাশা আমাদেরও ভাল লাগছে না। তা তাতে দরকারই বা কি, সোজাসুজি মালিককেই এত্তেলা দাও। বলো যে তুজন জেনানা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

'বেশ কথাটা বললে ! সত্যি ! কেন—তোমরা কি আমাদের গর্দানে দশটা ক'রে শির দেখেছ ? এত রাত্তিরে বাওরার মতো এই এত্তেলা দিতে গেলে তখনই আমাদের শির যাবে--নিশ্চিন্ত থাকো। তাছাড়া আমরা ফটকের পাহারাদার, এই বাগিচা পর্যন্ত আমাদের হুদ্দো, মকানে ওঠারই এক্তিয়ার নেই। সেখানে আলাদা পাহারা, খোজা মীরমদন খাঁ ওখানের সর্দার, তার সামনে গিয়ে এই কথা নিয়ে দাঁড়াবার হেমাকৎ আমাদের নেই।'

'বেশ, তাহলে ফটক খোল, আমরাই যাই' প্রহরিণী বলে ওঠে।

আলবৎ। এ তো হক কথা। কিন্তু জানো তো বিবিজী, এই রাত-তুপুরে এসব বাড়ির ফটক খোল বললেই খোলানো যায় না। ফটক খোলাতে চাও—ইশারা বাতাও আজকের রাতের—যে কুঞ্জীতে ফটক খুলবে তা বার করো।'

প্রহরিণী আবারও কি বলতে যাচ্ছিল, হাতের ইঙ্গিতে তাকে নিরস্ত ক'রে কিশোরী বাঁদীটি এগিয়ে এল। বলল, 'ফটক খোলবার দরকার নেই, আমরা ভেতরে যেতে চাই না। যে কাজে এসেছি সেটা সারা হলেই ঢের। একটা জিনিস শুধু রেখে যেতে চাই—তোমাদের মালিকের জন্যে। এটা কাল ভোরবেলা মালিকের ঘুম ভাঙ্গলে তাঁকে দিয়ে দিও, ব'লো যে এক আওরৎ এটা তাঁকে দিয়ে গেছে। এ দেখলেই তিনি বুঝতে পারবেন। খুব জরুরী ব্যাপার এটা—যদি খুব ফজিরেই তাঁর কাছে না পেঁছিয় তাহলে তোমাদেরই এর জন্যে জবাবদিহি করতে হবে, গর্দান যাওয়াও বিচিত্র নয়।'

'বটে! বটে! এমন চীজ! তা তুমি এই রাত দুপুরে এ তাজ্জব চীজ কোথা থেকে পেলে জাদু! গলা শুনে তো মনে হচ্ছে নেহাৎই নওজোয়ান লেড়কী তুমি! মোদ্দা এই বয়সেই অনেক ফন্দী আসে তো! বলি মতলবটা কি বলো দিকি? কোথায় থাকো তুমি? কোথা থেকে এলে, এলে তো সন্ধ্যের দিকে এলে না কেন? কিম্বা কাল ফজরে? এতই যদি জরুরী চীজ তো এই অসময়ে নিয়ে এলে কেন—জানো তো কোন ভদ্দরলোক এ সময়ে জেগে বসে থাকে না!'

স্পষ্ট অবিশ্বাস ও বিদ্রূপ পাহারাদারের কণ্ঠে।

বালিকাও ঈষৎ ধৈর্য হারায় এবার, অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে, 'অত কৈফিয়তে তোমার দরকার কি? আমি তো লুকিয়ে আসার চেষ্টা করি নি, সোজাসুজি সামনের রাস্তা দিয়ে বড় ফটকে এসেছি। আর আমি কিছু ভেতরেও ঢুকতে চাইছি না। একটা ছোট জিনিস দিয়ে যাচ্ছি—মনিবকে গিয়ে দেবে, এতে তোমার এত ভয় কিসের?'

'ঠিক আছে।' অন্য পাহারাদারটি এতক্ষণ চুপ করে ছিল, সে এবার প্রথমজনাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে এল, 'ঠিকই বলেছ তুমি। এত কথায় আমাদের সত্যিই কোন দরকার নেই। শুধু একটা কথা—কী আছে এতে তা না জেনে তো মালিককে দিতে

পারব না। মনে হচ্ছে আমাদের মালিককে চেন তুমি—তাহ'লে কেমন মানুষ তাও নিশ্চয় তোমার জানা আছে।…কোন গাফিলি মাফ করা তাঁর কেতাবে লেখা নেই, ও শব্দটাই কোন পুঁথিতে পড়েন নি তিনি। কাজে ভুলচুক হ'লে কোন কৈফিয়ৎ নেওয়াও তাঁর অভ্যাস নেই। হয় কাজ হাসিল করা চাই—নইলে গাফিলতির সাজা পেতে হবে। তুমি যা দিতে বলছ তা যদি কোন খতরার জিনিস হয়—বা এমন কিছু হয় যাতে তাঁর অপমান বোধ হ'তে পারে—তুমি কি মতলবে দিচ্ছ তা তো জানি না, তাঁকে অপমান করবার মতলবেই হয়ত এই গভীর রাতে ষড় ক'রে এসেছ—যা-শত্রু পরে-পরে—তোমার কাজ হাসিল হয়ে গেল, মনের ঝাল মিটল অথচ তার দায়টা পড়ল আমাদের ঘাড়ে—সে ক্ষেত্রে হাত পেতে নেওয়ার মানেই হ'ল আমাদের কয়েদ হওয়া বা গর্দান যাওয়া—আর আমাদের জরু ছাওয়ালের শুকিয়ে মরা। কাজেই ভাই বিবিজান, ওটা পেরে উঠব না। ভোর অবধি অপেক্ষা করো, মালিক উঠুন তাঁকে এত্তেলা পাঠাই—জিজ্ঞেস করি যে এক আনজান লেড়কীর কাছ থেকে কোন জিনিস নেব কি না—তারপর তাঁর হুকুম হ'লে অবিশ্যি নেব, কেন নেব না? আমাদের কি আপত্তি বলো না!'

এই বলে, নিজের মোচের দুই প্রান্তে একবার তা দিয়ে, চাপা গলায় একটু হেসেও নিল। নিজেরই বুদ্ধির তারিফের হাসি এটা।

'কিম্বা' প্রথমজন এতক্ষণ পরে একটু ফাঁক পেয়ে শুরু করল আবার, 'কী জিনিস দেখাও আগে, যদি বুঝি কোন বুরা চীজ নয়—তাহ'লে তোমার আরজিটা বিবেচনা ক'রে দেখব আর একবার।'

'দেখবে কিসে—এই আঁধিয়ারে? আলো কোথায়?' বাঁদী শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

'আছে, আছে। হুঁ-হুঁ, সে ব্যবস্থাও আছে। ফটকের পাশে আমাদের যে ঘর তাতে আঁধারে-লণ্ঠন আছে একটা। সে আলো চারিদিকে পড়ে না—শুধু একটা ছুঁচের মতো মুখ আছে, সেইখান

দিয়ে আলো এসে পড়ে একটু। তবে তাতে দেখা যায়—কাছে নিয়ে গিয়ে ধরলে।'

'তবে নিয়ে এসো তোমাদের সে লণ্ঠন। আমার দেখাতে কোন আপত্তি নেই।'

মুখের ওপর বোরখাটা আরও ভাল ক'রে টেনে দিয়ে হাতের জিনিসটা বাড়িয়ে ধরে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ায়।

ফটকের থামের পাশেই পাহারাদারদের ছোট চোরা কুট্‌রী, ছুটে গিয়ে সেখান থেকে লণ্ঠন আনতে দেরি হ'ল না ওদের। আলোটা বাগিয়ে ধরে ওরা দু'জনেই ঝুঁকে পড়ল জিনিসটা দেখতে। কিন্তু দেখতে দেখতে সে আগ্রহ বিস্ময়ে পরিণত হ'ল। একটু দেরি হয়েছিল বুঝতে জিনিসটা কি, কারণ কল্পনার রাশ সম্পূর্ণ আলগা ক'রে দিয়েও এ জিনিসের নাগাল পায় নি ওরা। বেশ কিছুক্ষণ ওদের দু'জনের বাক্যস্ফূর্তি হ'ল না। তারপর দু'জনেরই মুখ দিয়ে একটা টানা যে শব্দ উচ্চারিত হ'ল তা একটা দীর্ঘায়ত 'হ্যা—স্' ছাড়া আর কিছু নয়।

তারপরই চাপা কণ্ঠের রোষে ফেটে পড়ল যেন, 'তুমি এই রাত-দুপুরে এক খিলৌনা নিয়ে তামাশা করতে এসেছ আমাদের সঙ্গে! দিল্লগীর আর জাগা পাও নি! জানো যে আমাদের ওপর দরাজ হুকুম দেওয়া আছে—তেমন বুঝলে জেনানা বলে রেয়াৎ করব না! পালাও শিগ্‌গির আমাদের সামনে থেকে, বেমালুম ফর্সা হয়ে যাও—নইলে এক এক গুলিতে তোমাদের মাথার ঘিলু বার ক'রে ফুটানি ভেঙ্গে দেব চিরকালের মতো।...কুত্তীর সাজাই হচ্ছে মার—এ আমরা বিলক্ষণ জানি।'

বাঁদী এ অপমানেও বিশেষ বিচলিত হ'ল বলে মনে হ'ল না। তিরস্কারে তো নয়ই। শুধু এবার তার শুভ্র সুন্দর এক মুঠো চামেলি ফুলের মতো নরম বাঁ হাতখানাও বোরখার মধ্য থেকে বার ক'রে আঁধারে লণ্ঠনের সেই অতি সামান্য আলোকে মেলে ধরল ওদের

লুব্ধ দৃষ্টির সামনে। ওদের মতোই চাপা মৃদু কণ্ঠে ধমক দিয়ে উঠল, 'থামো! এত তো মালিকের দোহাই দিচ্ছ। সে দোহাই আমিও দিতে জানি। এটা কি দেখতে পাচ্ছ? চেনো?'

চাঁপার পাপড়ির মতো ঈষৎ বাঁকা নমনীয় যে আঙ্গুলগুলো প্রসারিত ওদের সামনে, মাথা ঘুরে যাবার পক্ষে তা-ই যথেষ্ট ; আর যা-ই হোক, এ হাত এ আঙ্গুল কোন সামান্য 'মুলকী' গাঁওয়ার মেয়ের হ'তে পারে না, খেটে-খাওয়া কোন গরীব আওরতেরও নয়—বড় কোন খানদানী ঘরের মেয়ে নিশ্চয়, শাহী হারেমের উপযুক্ত। ফুলের মতো হাত, ফুলের মতোই মুখও হবে—কিন্তু সে ফুলও সাধারণ বাগিচার নয়।

তবু সেটাই বড় কথা নয়। এই পদ্মের পাপড়ির মতো হাতের তালুতে যে বস্তুটা এই ক্ষীণ আলোতেও ঝকমক করছে—সেটার দিকে চেয়ে নিমেষে ঘেমে উঠল দু'জন সিপাহীই, পা দুটো অল্প অল্প কাঁপতে লাগল ওদের, তালু থেকে কণ্ঠ অবধি শুকিয়ে গেল ভয়ে। মেয়েটির হাতের বস্তুটি নিতান্তই একটা আংটি মাত্র—কিন্তু ওদের কাছে যদি শুধু একটা আংটিই হ'ত এটা!…এ আংটি ওরা চেনে। এ যার কাছে থাকতে পারে— সে সামান্য মানুষ নয়। এতক্ষণ যে ভাষায় কথা কয়েছে এর সঙ্গে, যে ঔদ্ধত্য ও ধৃষ্টতা প্রকাশ করেছে, তার শতাংশের একাংশও যদি মালিকের কানে পৌঁছয় তাহ'লে যে কী অবস্থা হবে তা ভাবতেও পারছে না ওরা। সে চিন্তার সূচনাতে, অস্পষ্ট একটা কল্পনাতেই ওদের এই দিশাহারা অবস্থা।…

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা সামলে উঠতে সময় লাগল কিছু। তার-পরই, দু'জনে প্রায় একসঙ্গে 'তওবা', 'তওবা' উচ্চারণ করতে করতে আভূমি একটা সেলাম করল, ওকে কিম্বা আংটিটাকে ঠিক বোঝা গেল না—তারপর যেন কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'কী সর্বনাশ। এ যে জনাবালির মোহরী আংটি! মুহর্-ই-সুলেমান!'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

প্রস্ফুট পদ্মদল আবার কোরকে পরিণত হ'ল বুঝি। মুঠিটা বন্ধ হয়ে গেল, হাতটাও ঢুকে গেল বোরখার মধ্যে—বিহ্বল হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখল সিপাহীরা। চেয়ে দেখল এবং চেয়েই রইল। শুনল যেন কোন্ দূরাগত শব্দ—মেয়েটি বলছে, 'হ্যাঁ, তাই। এখন তো বুঝলে এ কুত্তী মিছিমিছি এই রাত-দুপুরে দিল্লগী করতে আসে নি। কাজেই যা বলছি তা শোন—এটা কাল ফজরেই পৌঁছে দিও তোমাদের জনাবালিকে। ব'লো যে তাঁর এক বাঁদী, এক নগণ্যা সেবিকা এটা দিয়ে গেছে, এর অর্থ তিনি ঠিক বুঝতে পারবেন এই ভরসায়।'

আর দাঁড়াল না বাঁদী। এদের তরফ থেকে কোন বাদ-প্রতিবাদ কিম্বা অন্য কোন যুক্তি অবতারণার অবসর দিল না। তার কাজ হয়ে গেছে। ফটকের মধ্য দিয়েই একজনের শিথিল হাতে সেই বস্তুটা ধরিয়ে দিতে পেরেছে, ওদের ভাষায় 'খিলৌনা'। আর কোনও কথা উঠবে না তা সে জানে, এদের আর সাধ্য নেই কোন কথা বলার। এ অঙ্গুরীর মূল্য অঙ্গুরী যেদিন পায় সেদিন বোঝে নি, আজ বুঝছে। এটা যে এমনভাবে কাজে লাগবে তা ভাবে নি এতদিন। কাজে লাগবে বলে এতকাল নিভৃতে গোপনে সকল চক্ষুর অন্তরালে রক্ষা করে নি একে। অতি দুঃখের, অতি বেদনার স্মৃতি এটা ; দুঃসহ দুঃখ এবং অপরিসীম বেদনার সঙ্গে জড়িত সে স্মৃতি—তবু সে দুঃখও যে বড় মধুর, সে বেদনাও যে কাম্য। সে স্মৃতি তিলে তিলে দগ্ধ করেছে ওকে, করেছে ক্ষতবিক্ষত—তবু তার রোমন্থন ত্যাগ করতে পারে নি। ত্যাগ করতে চায়ও নি। কারণ তা পীড়ন করেছে যেমন—তেমনি অদ্ভুত অনির্বচনীয় একটা আনন্দও দিয়েছে! নিমের মধুর মতোই সে স্মৃতির স্বাদ, কটু কিন্তু মিষ্টও। মিষ্টত্বই বুঝি বেশী—তিক্ততার চেয়ে।...

তবে আজ সে ভেবে চিন্তেই এ আংটি সঙ্গে এনেছে, কাজে লাগতে পারে জেনেই। কাজে যে লেগেছে এতে তার খুশির সীমা

নেই। সত্যিই আজ সে তৃপ্ত, সে সুখী। এত দিনের এত যত্ন ক'রে রাখা সফল হয়েছে। এই স্মারকচিহ্নকে উপলক্ষ্য ক'রে যাঁকে পূজা ক'রে এসেছে সে. তাঁরই কাজে লেগেছে এটা—এতেই ওর সুখ। তিনি জানুন বা না জানুন ও আজ ধন্য, কৃতার্থ।

বাঁদী নিশ্চিন্ত হয়ে পিছন ফিরল। ডুলিওয়ালারা প্রস্তুতই ছিল, সে এসে ডুলিতে চড়া মাত্র তারা কাঁধে তুলে নিল। দেখতে দেখতে ডুলি, তার হু'জন বাহক এবং সেই প্রহরিণী অন্ধকারে মিলিয়ে গেল পিছন দিকের নির্জন বিসর্পিল পথে। মনে হ'ল যেন চারিদিক থেকে তরল অন্ধকার এসে গ্রাস করল চারটি প্রাণীর সেই মিলিত জীবন-বিন্দুটিকে।

দ্রুত চলল ডুলি। প্রায় ছুটেই চলল বাহকরা, দ্রুতই চলতে হবে তাদের ; শেষা কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠতে আর দেরি নেই, আকাশে তার আভাস দেখা দিয়েছে। ভোর হ'তেও দেরি নেই বিশেষ, এই চাঁদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই সূর্যের আবির্ভাবও ঘোষিত হবে উদয়দিগন্তে। সে পর্যন্ত অপেক্ষা করা চলবে না কিছুতেই। নিশাচর এরা—আঁধার-চারী, তিমিরাবসানের পূর্বেই এদের গিয়ে নিজ নিজ কোটরে আশ্রয় নিতে হবে। ওদের এই নৈশ অভিযানের কথা, এই প্রায়-অভিসারের কথা কাউকে জানানো চলবে না, মিথ্যায় এর শুরু, শেষ পর্যন্ত মিথ্যাতে ঢেকে রাখতে হবে এ ইতিহাস। অন্ধকার আর মিথ্যার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। সত্য গোপনের জন্যও আঁধারের বড় প্রয়োজন। আলোর সঙ্গে মিথ্যার চির-বিবাদ।

অবশ্য এরা পারবে তা। পূর্ব দিগন্তে আলোকোৎসব শুরু হবার বহু পূর্বেই ওরা পৌঁছে যাবে নিজেদের আশ্রয়ে। বাঁদী একবার ঘেরাটোপ সরিয়ে আকাশের অবস্থা দেখে নিল। এখনও দুই দণ্ড সময় আছে হাতে, তার মধ্যেই পৌঁছে দেবে বাহকরা। বক্‌শিসের লোভে যত না হোক, নিজেদের প্রাণের দায়েও।

নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসল সে। গরম এখনও হচ্ছে কিন্তু তা আর

অত কষ্টকর মনে হচ্ছে না। কিছু পূর্বের সেই আতঙ্কের আভাস মাত্র নেই তার মনে।··· ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল সে। ডান হাতখানা কপালে ঠেকিয়ে সোজা নামিয়ে বুকে ঠেকাল একবার, তারপর এক কাঁধ থেকে আর এক কাঁধ পর্যন্ত সেইভাবে যেন এক অদৃশ্য সরল রেখা আঁকল। বহুদিনের—শৈশবের শিক্ষা এটা, কিন্তু আজও ভোলে নি।

ঈশ্বরের পুত্র যে দুই কাঠের তৈরী যন্ত্রে নিহত হয়েছিলেন, এ তারই প্রতীকচিহ্ন। এই চিহ্ন আঁকলে তাঁকেই স্মরণ করা হয় নাকি, তাঁকে ধন্যবাদ জানানো হয়।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদই জানাল সে, অন্তরের সঙ্গে।

॥ ১ ॥

এ যেন কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল!

অকস্মাৎ খুব কাছে বজ্রপাত হ'লে নাকি মানুষের এমনি স্তম্ভিত অবস্থা হয়; কিন্তু সে রকম কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় না ঘটে, ঈশ্বরের প্রবল রোষ নেমে না এসেও যে এমন হ'তে পারে তা কে জানত! এখানে উপস্থিত কেউ কেউ সে রকম অবস্থাও দেখেছেন, এ যেন তার চেয়েও বেশী। একটি মানুষের সামান্য একটি আচরণে ও ছোট্ট একটি কথায়—মনে হ'ল সেখানে উপস্থিত সব কটি প্রাণী যেন নিমেষে পাথর হয়ে গেলেন।

শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজেব সাহসী তা সবাই জানে কিন্তু তিনি যে এমন দুঃসাহসী তা কেউ কোন দিন ভাবতে পারে নি। এর চেয়ে কামানের গোলার মুখে বুক পেতে দাঁড়ানোও যে ঢের সোজা। ছোট বেলায় শুধু তলোয়ার হাতে মাটিতে দাঁড়িয়ে পাগলা হাতীর সঙ্গে লড়াই করতে গিয়েছিলেন বলে বাদশা ওঁকে প্রচুর খেলাত ও 'বাহাদুর' উপাধি দিয়েছিলেন—কিন্তু সে বাহাদুরীও আজ এ আচরণের কাছে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর মনে হ'ল। এমন ধৃষ্টতার কথা কী ক'রে ভাবতে পারলেন। তিনি সেইটেই তো আশ্চর্য। পরমেশ্বর খুদা সর্বশক্তিমান ঠিকই—কিন্তু তিনি আপাত-অপ্রত্যক্ষ, বহুদূর। সর্বতোপূর্ণ বে-নিয়াজ বাদশা-সালামৎ শাহানশাহ্ প্রত্যক্ষ ও অদূরবর্তী—সে-হেতু অধিকতর ভয়ঙ্কর। এঁর ক্রোধ আলেম-ইমাম বর্ণিত সুদূর কোন সম্ভাবনা নয়, মৃত্যুর পর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় না তার পরিচয় পাবার জন্য—বাদশার রুদ্র রোষ সদ্য এবং অমোঘ, ঢের বেশী বাস্তব। সুদ্ধমাত্র তাঁর ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটিতেই তো ভস্মীভূত হয়ে যাবার কথা। শাহ্‌জাদাও তো তা জানেন, এক লহমায় কত লোককে বিনষ্ট হ'তে দেখেছেন তো নিজের চোখেই।

পদমর্যাদা, প্রতিপত্তি, পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত ঐশ্বর্য, ঘরবাড়ি—মায় সন্তানসন্ততির প্রাণসুদ্ধ কিছুই তো রেহাই পায় নি।

তবে এ বেয়াদবির সাহস পান কোথা থেকে তিনি? এতখানি ভরসা আসে কোথা থেকে?

স্বয়ং বাদশাও এই প্রশ্ন করেন নিজেকে বারবার।

তবে কি তিনি বেঁচে নেই আর? এ কি তিনি কবরের নিচে থেকে চেয়ে দেখছেন?

না কি— খোয়াব দেখছেন তিনি, এর কোনটাই বাস্তব সত্য নয়।

কিম্বা তাঁর সিংহাসনই কেড়ে নিয়েছে কেউ—তিনি এখন নাচার নালায়েকের পর্যায়ে পড়েছেন?

নইলে এরকম তো হবার কথা নয় কোন মতেই।

তিনি তামাম হিন্দুস্তানের ভাগ্যবিধাতা, শাহানশাহ্ আবুল মুজফ্ফর শিহাবউদ্দীন মুহম্মদ সাহিব-ই-কিরান, শাহ্জাহান, পাদশা গাজী—জীবিত এবং শাহীতখ্তে উপবিষ্ট থাকতেই এই ঔদ্ধত্য দেখতে হবে কেন?

কিসের এত ভরসা ওর? ও কি ভেবেছে যে তিনি একটু বেশী সন্তানবৎসল বলে তাঁর পুত্রস্নেহের সুযোগে এত বড় বেতমীজি ক'রেও নিস্তার পেয়ে যাবে? কোন কারণেই তিনি ছেলেকে শাস্তি দেবেন না, এই বোধ হয় ওর বিশ্বাস!

হায় রে মূর্খ! এ যে কত বড় ভুল তা যখন বুঝবে তখন যে আর অনুশোচনারও অবকাশ পাবে না!···তিনি স্নেহপরায়ণ পিতা হ'তে পারেন কিন্তু তিনি এত বড় সাম্রাজ্যের শাসকও। বাদশা সর্বাগ্রে বাদশা—তারপর সংসারী মানুষ। পিতা, স্বামী, পুত্র—কোনটাই তাঁর সম্যক পরিচয় নয়—বাদশা ছাড়া।

নিজের সন্তান বলে এতবড় গোস্তাকীও যদি আজ তিনি মাফ্ করেন তো কাল এ মুলুকের কেউ তাঁকে ভয় করবে না, মান্য করবে না। সন্তান বলে আরও কঠোর হ'তে হবে তাঁকে, কিছুমাত্র দয়ামায়া

করা চলবে না। অন্তরে যত আঘাতই লাগুক তাঁর এ নাদানির প্রাপ্য সাজা তাঁকে দিতেই হবে।…

অথচ এর কোন প্রয়োজনই তো ছিল না।

বরং না-ই আসতে পারত আদৌ। তাতে কিছুই মনে করতেন না তিনি।

তিনিও না, গৃহস্বামীও না।

বাদশা তো তাই-ই ভেবেছিলেন প্রথমে। আওরঙ্গজেব এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে রাজী হবেন না, সবিনয় সৌজন্যের সঙ্গে কোন যুক্তি-সহ মধুর কৈফিয়তে এড়িয়ে যাবেন—এই ছিল তাঁর ধারণা। তাঁর প্রথম ও তৃতীয় পুত্রের মধ্যে যে কিছুমাত্র প্রীতির সম্পর্ক নেই, তা এ মুলুকের কে না জানে! ওদের এ আদাওতি রেষারেষি বোধ করি আজ তামাম হিন্দুস্তানের কহানী-কিস্‌সার উপাদান হয়ে উঠেছে। আওরঙ্গজেবের বিশ্বাস তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারা শুকোহ্ বাদশার প্রিয়তম পুত্র, নয়নের মণি ; আর তিনি ওঁর দৃষ্টিশূল। তাঁর আরও বিশ্বাস যে, এ অকারণ পক্ষপাত একেবারেই অপাত্রে ন্যস্ত হয়েছে। রীতিমতো বে-ইনসাফি এটা—অবিচার। এই অবারিত উদার প্রশ্রয় পাবার কোন যোগ্যতাই তাঁর জ্যেষ্ঠ অগ্রজের নেই।

দারা সম্বন্ধে তাঁর এ মনোভাব আওরঙ্গজেব গোপন করারও বিশেষ চেষ্টা করেন নি। বরং এমন সব আসরে অনুযোগ করেছেন যাতে শাহানশাহের কর্ণগোচর হওয়া সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত হ'তে পারেন! দারা আজ পর্যন্ত না যুদ্ধে, না রাজ্য-সংগঠনে বা শাসনে—কোথাও কোন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি। পিতার স্নেহ-চ্ছত্রছায়ায় আরামে আলস্যে ও বিলাসে প্রতিপালিত হচ্ছেন মাত্র। অথচ এই অকর্মণ্য অপদার্থ নকারা পুত্রটির উপরেই শাহানশাহের অকৃপণ অনুগ্রহ। কারণে অকারণে লক্ষ লক্ষ টাকা, মোহর, জহরৎ ও খিলাত বর্ষিত হচ্ছে, জায়গীরের পর জায়গীর লিখে দেওয়া হচ্ছে তাঁকে। একমাত্র গুণ দারাশুকোর যে তিনি সর্বদা পিতার কাছে

কাছে থাকেন। কিন্তু সেও তো বাদশারই ব্যবস্থা। তিনিই অন্য ছেলেদের দূরে দূরে পাঠিয়ে দেন ; সুবাদার বা নাজিম ক'রে—কিংবা কোন লড়াইতে প্রধান সেনানায়ক ক'রে।

আওরঙ্গজেবের এসব অভিযোগ বাদশা অবগত আছেন। বিশেষ ক'রে কন্যা জাহান্-আরার মারফৎ এসব খবর নিয়মিত পান তিনি। অন্তঃপুরের সব খবরই সে সংগ্রহ ক'রে এনে দেয়। ভাইদের সকল-কার বাড়িই তার অবাধ গতিবিধি, সকলেই তাকে বিশ্বাস করে, সম্ভ্রম করে।

ভাইয়ে ভাইয়ে এরকম মনোভাব যে ভাল নয়—বিশেষত তাঁর পুত্রদের মধ্যে, তা বাদশাও বোঝেন। ঈর্ষা থেকে বিদ্বেষ বেশী দূর নয়। এমনিই, লোভ বলবান। এত বড় বিপুল সাম্রাজ্যের তখ্‌ৎ তাঁর কোন ছেলেই সহজে ছেড়ে দেবে না, একটা লড়াই ঝগড়া বাধবেই। কতকটা সেই জন্যেই আরও তিনি অন্য ছেলেদের দূরে দূরে রাখেন। হঠাৎ কোনদিন আকস্মিক কোন কারণে তাঁর এন্তেকাল হ'লে তারা রাজধানীতে পোঁছবার আগেই তখ্‌ৎ এবং তার আনুষঙ্গিক সেলেখানা ও শাহী খাজানা দখল ক'রে বসতে পারবেন দারা শুকোহ। তখন অন্য ভাইদের দমন করা শক্ত হবে না তাঁর পক্ষে। বাদশা অবশ্য বলে যাবেন—বার বার বলে রেখেওছেন ইতিমধ্যেই—দারা যাতে অন্য ভাইদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেন, যেন একটু স্নেহ ও প্রশ্রয়ের চোখে দেখেন। তারা যেমন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে শাসক হয়ে আছে তেমনিই যেন থাকতে পায়। দারাও তা করবেন—পিতার কাছে শপথ করেছেন।

অবশ্য এই কাছে রাখাটা জাহান্-আরাও সমর্থন করে না বিশেষ। সে বলে—আওরঙ্গজেবের মতো বিদ্বেষ থেকে নয়, দারার কল্যাণ ভেবেই—যে এতে ক'রে তিনি একেবারে অপদার্থ নাজুক ক'রেই তুলছেন তাঁর প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ পুত্রকে। হাতে কলমে কিছু করার সুযোগ না থাকায় তিনি শাসনকার্য বা যুদ্ধকৌশল কিছুই

শিখতে পেলেন না। শুধুই শাস্ত্রচর্চায় এবং লেখাপড়ায় অমূল্য সময় কাটিয়ে দিচ্ছেন দারা শুকোহ্। জ্ঞানচর্চা খারাপ কাজ নয়—খুবই ভাল বরং, কিন্তু সম্রাটপুত্র এবং ভাবী সম্রাটের পুঁথির বাইরেও অনেক কিছু শেখবার আছে। বিদ্যা যতই বাড়ুক, এই অহর্নিশি ধর্মশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র চর্চা করার ফলে—কর্মদক্ষতা ও অভিজ্ঞতা কিছুমাত্র লাভ হচ্ছে না। এর পর যখন একদা এই বিরাট মুলুকের শাসন ও রক্ষণের ভার তাঁর ওপর এসে পড়বে তখন কী ক'রে সামলাবেন তিনি সব দিক ? বাদশা এত বুদ্ধি ধরেন অথচ একথাটা একবারও ভেবে দেখলেন না এইটেই জাহান্-আরার আপসোস।

ভেবে যে একেবারে দেখেন নি শাহান্‌শাহ্—তা নয়। যুক্তিটা যে ঠিক তাও স্বীকার করেন। তবুও দারাকে কাছছাড়া করতে মন সরে না তাঁর। মনে হয় লেখাপড়া ভালবাসে করুক। এর পর তো আর অবসর পাবে না। আর জ্ঞান অভিজ্ঞতা শৌর্য ? তাঁর ছেলে, বিদ্বান বুদ্ধিমান স্থিতধী ছেলে—সে কি পারবে না কার্যকালে নিজেকে অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে ?

এই লেখাপড়া বা শাস্ত্রচর্চাটাও আওরঙ্গজেবের বিষম চক্ষুশূল। দারা কাফেরদের কাছে বেদান্ত পড়েন, সুফীদের সঙ্গে দর্শন শাস্ত্র আলোচনা করেন: হাদিসে পূর্ণ বিশ্বাস নেই, ইসলামের শরীয়ত মেনে চলেন না—সম্পূর্ণ নাস্তিকের মতো ব্যবহার। যুক্তিতর্ক দিয়ে হাদিস লঙ্ঘন করতে চান, ধর্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে অদ্ভুত মনোভাব তাঁর। এদিক দিয়ে আওরঙ্গজেব একেবারেই বিপরীত, এই বয়সেই গোঁড়া মুসলমান তিনি, প্রতিটি আচরণে দীনিয়াত মেনে চলেন। দারা চান তাঁর প্রপিতামহ আকবর শা'র মতো নূতন উদার ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করতে—আওরঙ্গজেব তকলিদের পক্ষপাতী। পূর্বসূরীগণ যে মত বিশ্বাস ক'রে গেছেন—কয়েক শতাব্দীর প্রায় হাজার বছরের ব্যবহারে যা টিকে আছে—সে মত ভ্রান্ত তা তিনি কানে শুনতেও রাজী নন।

পুরাতন প্রচলিত পথই নিরাপদ, তা ছেড়ে তিনি অজানা পথে চলতে যাবেনই বা কেন ?···

এই বয়সে এতখানি মানসিক দৃঢ়তা দেখা যায় না। বাদশা এই কারণেই তাঁর তৃতীয় পুত্রকে একটু সমীহ ক'রে চলেন ! আওরঙ্গজেব মনে করেন যে, পিতা তাঁকে দেখতে পারেন না—উপেক্ষা করেন, সেটা সম্পূর্ণ ভুল। উপেক্ষার পাত্র নয় তাঁর এ ছেলেটি—তা তিনি ভাল ক'রেই জানেন। এটুকু মানুষ চেনার ক্ষমতা না থাকলে এত বড় সাম্রাজ্য শাসন করতে পারতেন না তিনি, এতদিন ধরে সর্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারতেন না। উপেক্ষা তো করেনই না —বরং বিপরীত, রীতিমতো ভয় করেন, সমীহ করেন। সে দুর্ধর্ষ বীর, চরম দুঃসাহসী, প্রখর বুদ্ধিমান। অদ্ভুত চরিত্রবল তার। সে মদ খায় না, ফুর্তি শব্দই জানে না বোধ হয়। আরামে ও আলস্যে তার প্রবল ঘৃণা। সর্বোপরি এই বয়সেই তার এত গভীর ধর্মনিষ্ঠা ও বিশ্বাস—সবটা জড়িয়ে এক বিচিত্র ও অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব। এই ছেলেটিকে যখনই দেখেন, ইস্পাতের তরবারির কথা মনে পড়ে তাঁর। তেমনি কঠিন—তেমনি অনমনীয়। এই জন্যেই তিনি দূরে দূরে রাখেন ওকে, দূরেই রাখবেন স্থির করেছেন।

কিন্তু সে যা-ই হোক, দুই ভাইয়ের মধ্যে রেষারেষিটা কারও অবিদিত নেই আর। ওঁরাও যে সেটা গোপন করার খুব বেশী চেষ্টা করেছেন তা নয়। সুতরাং গত সপ্তাহে যখন শাহ্‌জাদা দারা শুকোহ্‌ তাঁর গরিবখানায় এই দাওয়াত জানিয়ে গেলেন—তখন বাদশা নিশ্চিত ভেবেছিলেন যে, আওরঙ্গজেব এ নিমন্ত্রণ রক্ষা করবেন না, কোন একটা ছুতোয় এড়িয়ে যাবেন। বিশেষতঃ যখন এই নিমন্ত্রণের মধ্যেই ঈর্ষার একটা বড় রকম কারণ ছিল।

এ দাওয়াতের উপলক্ষটাই সেই কারণ।

দারা শুকোহ্‌ সম্প্রতি যমুনার তীরে একটি নতুন প্রাসাদ তৈরী করিয়েছেন। নদীর বুক থেকে বলতে গেলে বাঁধিয়ে তুলেছেন সাদা

পাথরের সুদৃশ্য সুবিস্তৃত এই হর্ম্যটি—তাকে সর্বপ্রকার আরামের ও বিলাসের উপকরণ দিয়ে সাজিয়েছেন। দারা এর আগে যে বাড়িতে থাকতেন তাও ছোট নয়, শুধু অনেকদিন তাতে বাস করেছেন বলেই এই নতুন প্রাসাদের আয়োজন। বেশ কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এ প্রাসাদ নির্মাণ করতে—আর বলা বাহুল্য, তার প্রায় সবটাই যুগিয়েছেন শাহানশাহ্ স্বয়ং। তাতেও হয় নি—বাড়ি সাজাতে ফিরিঙ্গি মুলুকের আয়না, বাতির ঝাড়, বোখারার কার্পেট এবং নানা রকমের মূল্যবান আসবাব পাঠিয়ে দিয়েছেন। বাদশার নিজের ব্যবহারের আতর ও গুলাব পাঠিয়েছেন বাক্স বোঝাই ক'রে। গালিচাই পাঠিয়েছেন চৌদ্দ পনেরো বোঝা, সমসংখ্যক উটের পিঠে চাপিয়ে। এসব জিনিসের মহার্ঘতা সর্বজনবিদিত। কিন্তু মূল্যের প্রশ্ন বাদ দিয়েও, বাদশার যে অপরিমাণ স্নেহ প্রকাশ পেয়েছে এই সব উপহারের মধ্য দিয়ে—অপর ভ্রাতাদের মনে ঈর্ষার সৃষ্টি করার পক্ষে তা যথেষ্ট, বরং অতিরিক্ত বলাই উচিত।

দারা অবশ্য তা ভাবেন না। যে পায় সে যতই পাক সেটা তার প্রাপ্য বলেই মনে করে। সুতরাং তাঁর বিশ্বাস যে, তাঁর এই সৌভাগ্যে সকলেই আনন্দিত। তিনি তাই খুশীমনেই এসেছিলেন তাঁর দাওয়াত জানাতে।

সমস্ত প্রস্তুত, প্রাসাদ মায় প্রাসাদের সংলগ্ন বিস্তৃত উদ্যান পর্যন্ত মোটামুটি তৈরী হয়ে গেছে,—বাড়ির সঙ্গে সঙ্গেই এ কাজ শুরু করেছিলেন দারা, যাতে বাড়িতে বাস করতে আসার সময় গাছে-পালায় ফলেফুলে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তা—তার মধ্যে নহর ফোয়ারা সব চালু—কোথাও কোন ত্রুটি কি খুঁৎ তো নজরে পড়ছে না, শুধু একটি অভাব থেকে গিয়েছে, এই সুন্দর বস্তুটি একটু পবিত্র ক'রে নেওয়া হয় নি। আর সেটুকু না হওয়া পর্যন্ত শাহ্‌জাদা ঠিক স্বস্তি পাচ্ছেন না। সুতরাং কোন এক শুভদিনে যদি আলাহজরৎ দয়া ক'রে পায়ের ধূলো দিয়ে তাঁর নতুন গরিবখানাকে প্রসাদী ক'রে

দেন তো শাহ্‌জাদা চিরকৃতজ্ঞ থাকবেন। খাদ্য যতই রসনাতৃপ্তিকর বা সুরভিত হোক,—ঈশ্বরের উদ্দেশে নিবেদিত বা তবর্‌রুক না হ'লে তা যথার্থ সুখাদ্যে পরিণত হয় না। তেমনি এই প্রাসাদও, যত সুন্দর আর লোভনীয়ই হোক—শাহানশাহে্‌র পদার্পণ না ঘটলে তাকে বসবাসযোগ্য মনে করবেন না শাহ্‌জাদা দারা শুকোহ্‌।

দাওয়াত কিন্তু এখানেই শেষ হয় নি।

আরও কিছু প্রার্থনা জানিয়েছেন বড়ে শাহ্‌জাদা।

আলম্‌পনাহ্‌ তো যাবেনই—সেই সঙ্গে তাঁর প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ভাইরা—অন্য শাহ্‌জাদারাও যদি দয়া ক'রে যান তো কৃতার্থ হবেন তিনি, এও জানলেন। সৌভাগ্যক্রমে যখন এসময়ে তাঁর তিনটি ভাই-ই আগ্রায় উপস্থিত আছেন তখন এ আনন্দ থেকে তিনি বঞ্চিত হবেন কেন? এক সঙ্গে বাজান ও চার ভাই তাঁরা একত্রে বসে আহার করবেন—কিছুদিন ধরেই এ ইচ্ছা প্রবল হয়েছে তাঁর। এ খুদারই যোগাযোগ, তাই তাঁর গরিবখানার নির্মাণকার্য শেষ হবার সময়-সময়ই ভাইজানরা সকলে আগ্রায় এসে উপস্থিত হয়েছেন।...

শাহানশাহ্‌ তো প্রস্তুতই—বরং বলা যায়, মনে মনে এ নিমন্ত্রণের অপেক্ষাই করছিলেন তিনি। তবে তাঁর অন্য পুত্রদের সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ ছিল তাঁর। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে, তাঁর সে আশঙ্কা বা সংশয় সম্পূর্ণ অমূলক। দারা যখন একে একে তাঁদের কাছে নিমন্ত্রণ জানাতে গেলেন তখন তিনজনেই সে আমন্ত্রণ সাগ্রহে গ্রহণ করলেন। বোধ হয় ঈর্ষার চেয়ে কৌতূহল বেশী বলবান, অথবা ঈর্ষাই কৌতূহলকে প্রবল ক'রে তোলে। মানসিক যন্ত্রণার একটা নেশা আছে, যে চিন্তায় যন্ত্রণা বাড়ে, মন ঘুরে ফিরে সেই দিকেই যেতে চায়। সৌভাগ্যে ঈর্ষিত সবাই, তবু সে সৌভাগ্যের পরিমাণটাও নির্ণয় করা চাই বৈকি!

দিন-ক্ষণ দারা দেখেই গিয়েছিলেন—জ্যোতিষীদের দ্বারা তিথি-নক্ষত্র দেখিয়ে। বাদশারও সে দিনে কোন অসুবিধা দেখা গেল

না। আর বাদশা যেখানে রাজী সেখানে শাহ্‌জাদাদের তো আপত্তির প্রশ্নই ওঠে না।

তবু শাহানশাহ্‌ ভেবেছিলেন, শেষমুহূর্তে আওরঙ্গজেব একটা কোন ওজর করবেন না-যাওয়ার। আর কিছু না হোক—অসুখই তো একটা চমৎকার অজুহাত, যার ওপর বাদশারও কোন হাত নেই। তাঁর ছেলেরা অবশ্য সকলেই স্বাস্থ্যবান, তৈমুরবংশের স্বাস্থ্য শক্তি ও রূপ—তিনই তাঁরা পেয়েছেন পূর্ণমাত্রাতে—তবু ওজর হিসেবে অসুখ হ'তে কোন বাধা নেই। বিশেষ ক'রে উদরাময়—এমন একটা রোগ—যা যে-কোন দিন যে-কোন লোকের হ'তে পারে। আবার তা একদিনেও সেরে যেতে পারে—প্রয়োজনমতো।

কিন্তু সে সব দিক দিয়েই গেলেন না শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজেব, কোন ওজর আপত্তি কিছুই তুললেন না। বরং নির্দিষ্ট দিনে, বাদশা আসবার অনেক আগেই, দেখা গেল তাঁর বজরা এসে শাহী বজরার ধারে—বাদশার প্রাপ্য সম্মান হিসেবে সামান্য ব্যবধান বজায় রেখে অপেক্ষা করছে।

বাদশার বুক থেকে যেন পাষাণভার নেমে গেল একটা।

অন্য ছেলেদের জন্য নয়—আর কেউ না এলেও বিচলিত হতেন না তিনি—ভয় ছিল তাঁর এই তৃতীয় পুত্রটির জন্যেই বেশী। সে ভয় অমূলক জেনে খুশির সীমা রইল না তাঁর। আজকের এই যাত্রাটা সত্যিই সুযাত্রা বলে মনে হ'ল। মনে মনে খুদাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর এই সব কটি বাচ্চার জন্যই নতুন ক'রে দোয়া প্রার্থনা করলেন। দারার এই নতুন বাড়ির আয়-পয় ভাল—এ ধরনের কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয় জেনেও—মনে মনে স্বীকার করলেন।

খুশী হয়েছিলেন বাদশা, খুশির পাত্র পূর্ণতর করার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলেন।

অনেকগুলো বজরা হাজির ছিল, ছেলেরা প্রত্যেকেই নিজস্ব

বজরা এনেছিলেন—আলাদা আলাদাই যাওয়ার কথা—কিন্তু বাদশা সে ব্যবস্থা নাকচ ক'রে দিলেন। তিন ছেলেকেই ডেকে নিজের বজরায় তুলে নিলেন। বাইরের লোকের মধ্যে রইলেন শুধু উজীর-এ-আজম বা প্রধানমন্ত্রী, তা তিনি প্রায় ঘরের লোকের মতোই অন্তরঙ্গ। বহুদিন পরে ছেলেদের সঙ্গে এমন নিরিবিলি গল্পগুজব করার সুযোগ পেয়ে যেন আনন্দে মেতে উঠলেন বাদশা, ছেলেমানুষের মতো ঠাট্টা-তামাশা করতে লাগলেন, তার মধ্যে ভাষার আগলও বজায় রইল না সব সময়ে, এমন কি কোন্ ছেলে নতুন কোন্ বাঁদী সংগ্রহ করল, তাঁদের 'উমর্' কত—চোখ টিপে হেসে সে প্রশ্ন করতেও ছাড়লেন না।

আসলে ছেলেরা যে দারার এ নতুন সৌভাগ্যে ঈর্ষিত হয়ে এ দাওয়াত এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে নি—তাতেই তাঁর এত আনন্দ।

ছেলেদের কাছে যেন নিজেকে কৃতজ্ঞ বোধ করতে লাগলেন তিনি।

॥ ২ ॥

সত্যি কথা বলতে কি, আজকে সকাল থেকেই দিনটা বড় মনোহর মনে হয়েছিল। ভারী ভাল লেগেছিল বাদশার এই যাত্রাটা। ঝলমলে রৌদ্রোজ্জ্বল প্রভাত, মধুর প্রভাতী হাওয়া—মন এমনিতেই প্রসন্ন হয়ে ওঠার কথা। তার ওপর পরিবেশটিও ছিল ভারী অনুকূল। কিল্লা থেকে দরিয়ার ধারে ধারে যত প্রাসাদ, সবগুলিই ফুলেপাতায় সাজানো হয়েছে—বাদশার প্রীতি বর্ধনের জন্য। নহবৎ এমনিতেই বাজে, কিল্লাতে তো বটেই—প্রায় সব 'রইস' লোকেরই নিজস্ব নহবতের ব্যবস্থা আছে। আজ সেসব সানাইওয়ালারাও প্রাণপণে সুর ধরেছে বাঁশীতে; বাদশাকে শোনাবার এমন সুযোগ

আবার কবে আসবে কে জানে—হয়ত হঠাৎ কানে লেগে গিয়ে তাঁর কৌতূহল আকৃষ্ট করাও অসম্ভব নয়। ফলে, সেই বিভিন্ন রাগিণীর মিশ্রিত সুর-লহরীতে যমুনাতীরের বাতাস যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন। ফুলের গন্ধে বাঁশীর সুরে যমুনার মিষ্টি স্নিগ্ধ বাতাসে—সর্বত্রই সেই স্বপ্নের বীজ। ঘাটে ঘাটে বাদশার দর্শনার্থী সুবেশ সুশ্রী নর-নারীর ভীড়—তাদের প্রিয় নৃপতিকে চোখে দেখবার জন্য সে কী ব্যাকুলতা! এই অনুক্ত স্তুতিতেও মনে একটা নেশা জাগায়। সর্বোপরি, বহুকাল পরে তাঁর প্রিয় আত্মজদের সাহচর্য। এতেও যদি ভাল না লাগে তো আর ভালা লাগা সম্ভব নয়। ছেলেদের মধ্যে শুধু দারাই নেই, তা তার কাছেই তো যাচ্ছেন; একটু পরেই চার ছেলেকে এক সঙ্গে কাছে পাবেন।

বাদশা যেন আজকের এই পরিণত প্রভাতের বেলাটুকুর প্রতিটি মুহূর্ত ছুঁয়ে ছুঁয়ে এসেছেন—সময়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অবসরগুলিও উপভোগ করতে করতে। আজ এই নদীপথে নৌকোয় চেপে ভেসে আসতে আসতে বার বার অতর্কিতে মনে হয়েছে তাঁর যে, সত্যিই তিনি আজ এ দুনিয়ার মধ্যে সব চেয়ে সুখী ও সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি।

নদীপথে আসার এই পরিকল্পনাটাও বাদশারই।

স্থলপথে বড় ভীড়—বাদশার যাত্রায় বড় আড়ম্বর। সামান্য পথ, বোধ হয় এক ক্রোশও নয় কিন্তু সেইটুকু অতিক্রম করতেই এক প্রহর পার হ'ত। আর তাতে এমন অন্তরঙ্গভাবে পেতেন না ছেলেদের, এমন আলাপ কি খোশগল্পেরও সুযোগ মিলত না। জলপথেও জাঁকজমক কম নেই, রক্ষী-বাহিনীর ব্যবস্থা আছে, লোকলস্কর অসংখ্য থাকে সঙ্গে, তাতারী দেহরক্ষীরা তো থাকেই—কিন্তু তারা আগু-পিছু স্বতন্ত্র নৌকোয় থেকে পাহারা দেয়—বেশ খানিকটা সসম্ভ্রম ব্যবধান বজায় রেখে; বাদশাকে শান্তিতে ও নিভৃতে থাকার সুযোগ দিয়ে। জনতা বা প্রজাসাধারণের পূজাও পান

কিন্তু এখানে পথের মতো পূজকের দল হুমড়ি খেয়ে গায়ে পড়তে চেষ্টা করে না, ভীড় ক'রে পথ আটকাতে পারে না। পূজার তৃপ্তি আছে এখানে, বিরক্তিটা নেই। সেই জন্যেই আজ এই পথ বেছে নিয়েছিলেন শাহানশাহ্।

তাছাড়া, দারার বাড়িও দরিয়ার ওপরে। পাড় থেকে ঘাট বেঁধে সিঁড়ি উঠেছে। আগ্রার গরম বিখ্যাত, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে যখন চারিদিক থেকে অগ্নিবৃষ্টি হ'তে থাকে, খাঁ-খাঁ করে রুক্ষ শহর আগুনের নিঃশ্বাস ফেলে, তখন যা কিছু শান্তি এই নদীর ধারেই। নহর ফোয়ারা বসাবারও সুযোগ বেশী এখানে, নদী থেকে জল সামান্য একটু ওপরে তোলা খুব একটা কষ্টসাধ্য নয়, বাগানবাগিচা বানাতেও কূয়া থেকে বয়েল দিয়ে জল তুলতে হয় না, নদীর জলেই কাজ চলে যায়। কূয়ার জলে বাগান করাও তো মুশ্‌কিল, বেশির-ভাগ কূয়ার জলেই ক্ষার আছে এখানে—ভাল গাছ মরে যায়।

তা বড়ে শাহ্‌জাদা দারার রুচিবোধ আছে এটা মানতেই হবে। ইমারতের মূল পরিকল্পনা অবশ্য খোদ শাহানশাহেরই—কিন্তু কল্পনা আর বাস্তবে অনেক তফাৎ। সুকল্পনাকে নিখুঁত ভাবে রূপ দিতেও কিছু রুচি ও নিজস্ব কল্পনাশক্তির প্রয়োজন। যমুনার তীরে সাদা পাখীর মতো হাল্‌কা বাড়িটি, কালো জলে তার ছায়া পড়ে ছবির মতো দেখাচ্ছে দূর থেকে। হাল্‌কা কিন্তু সে শুধু গঠনের ভঙ্গীটাই নইলে প্রাসাদ আদৌ ছোট নয়। কাছে এলে বা ভিতরে ঢুকলে সেটা বোঝা যায়। বিশাল হর্ম্যের উপযুক্ত প্রশস্ত ঘাট, ঘাট থেকে চওড়া সাদা পাথরের সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরে, একেবারে ভিতর মহল পর্যন্ত।

সেই শুভ্র মর্মরের সিঁড়িতে, বাদশার শুভ পদার্পণ উপলক্ষে রচিত মেহরাবের নিচে বেশির ভাগ লাল রঙের দামী ইস্পাহানী কার্পেট পাতা আর সেই বিপুল লাল রঙের মধ্যে—যেন লাল সরোবরে শ্বেতপদ্মের মতো—আগাগোড়া শুভ্র মসলিনের পোশাকপরা দারা

শুকোহ্ করজোড়ে নত মস্তকে দাঁড়িয়েছিলেন এঁদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। একেবারে জলের ধারে এসে দাঁড়িয়েছিলেন—কারণ বাদশার হাত ধরে নামাবার গৌরব তিনি অপর কাউকে দিতে রাজী নন। লোকলস্কর তাঁরও কম নেই—আত্মীয়-পরিজন বান্দা-খোজা-খাবাস-খানসামায় প্রাসাদ বোঝাই—কিন্তু ইচ্ছা ক'রেই তাদের দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন দারা—সম্রাট পিতাকে তিনি একাই স্বাগত জানাবেন— যথেষ্ট বিনয় ও দৈন্যের সঙ্গে—সেই তাঁর ইচ্ছা।

তারপর--বাদশা যখন সত্যিসত্যি তশরীফ আনলেন দারার এই গরিবখানায়, অর্থাৎ তাঁর বজরা এসে ঘাটে ভিড়ল, তখন দারা সেইভাবে -প্রায় নতমস্তকেই তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বাদশার পবিত্র হাত ধরে সাবধানে ও সন্তর্পণে নৌকো থেকে নামিয়ে, সেইখানে সেই সিঁড়ির উপরেই হাঁটু গেড়ে বসে তাঁর পরিচ্ছদের প্রান্ত চুম্বন ক'রে বাদশা এবং পিতার প্রাপ্য উপযুক্ত সম্মান প্রকাশ করলেন।

বাদশা অবশ্য এ শরাফৎ বা সৌজন্যের জন্য প্রস্তুতই ছিলেন, তার পুরস্কারও এনেছিলেন সঙ্গে ক'রে। তিনিও শশব্যস্তে চরণপ্রান্তে আনত পুত্রকে হাত ধরে উঠিয়ে প্রগাঢ় সস্নেহ আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন; তারপর ভৃত্যদের ইঙ্গিত করলেন, তারা সেইখানেই শাহ্জাদার জন্য আনীত খিলাৎ ও অন্যান্য উপঢৌকন এনে ধরল। অতঃপর বাদশা তাঁর দস্তমোবারক দ্বারা সেই উপহার দ্রব্যগুলি একবার ক'রে স্পর্শ ক'রে দিয়ে সপ্রীত চোখে পুত্রের মুখের দিকে চাইলেন, দারাও তবর্‌রুক হিসেবে সেগুলি একবার ক'রে মাথায় ঠেকিয়ে যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করলেন। এইভাবে সৌজন্যের প্রথম পাট চুকতে শাহানশাহ্ ধীরে ধীরে পুত্রের নবনির্মিত প্রাসাদের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলেন—চারিদিকে চাইতে চাইতে।

বড়ে শাহ্জাদা তাঁর ভাইদেরও যথাযোগ্য অভ্যর্থনা জানালেন। বরং একটু বেশীই বিনয়প্রকাশ করলেন যেন। তাঁর তক্‌দিরে এরা

যে ঈর্ষিত তা তিনি কিছুটা বোঝেন। কিন্তু সে বোঝাটা এঁদের বুঝতে দিলে চলবে না। তাঁর আচার-আচরণে যেন কোন রকম তকব্বরি বা বাহাদুরীর ভাব না প্রকাশ পায়। ছোট ভাই সব—তবু আজ এঁরা তাঁর মেহ্‌মান, আর মেহ্‌মান মাত্রেই পুজনীয়। তিনি ভাইদের সস্নেহে আলিঙ্গন ক'রে সযত্নে ও সসম্মানে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন ওপরে।

এ পর্যন্ত বেশ কেটেছিল। মনে হয়েছিল আজকের প্রভাত যথার্থ সুপ্রভাত। আজকের দিনটির স্মৃতি অনন্ত মাধুর্যের উৎস হয়ে থাকবে মনের মণিকোঠায়।

এমন কি খাওয়া-দাওয়ার সময়ও সে সুমধুর প্রসন্নতার সুর ভঙ্গ হয় নি। আহারের আগে দারা যখন রীতিমাফিক মান্য অতিথিদের জন্যে স্বহস্তে দস্তরখান* পাততে গেলেন তখন স্বয়ং আওরঙ্গজেব সেটা তাঁর হাত থেকে টেনে নিয়ে নিজে পরিপাটি ক'রে পেতে দিলেন। দেখা গেল—স্বয়ং বাদশাও সেটা মনে মনে মানতে বাধ্য হলেন যে—এ কাজেও বাদশার এই তৃতীয় পুত্রটি অনেক দক্ষ। দারা হ'লে এমনভাবে এ কাজ সুসম্পন্ন হ'ত না। তিনি হাত দিয়ে স্পর্শ ক'রে দিতেন মাত্র, পরে দাসীদেরই আসল কাজটা করতে হ'ত।

এমনি ক'রে খুশির পর খুশির ঢেউ উঠেছিল বাদশার মনে। নেশার মতো গোলাপী আমেজ লেগেছিল একটা। ফুর্তিতে উচ্ছল হয়ে উঠেছিলেন তাই। খাওয়ার সময়ও সে আমেজ কাটে নি—সুর ভঙ্গ হয় নি প্রসন্নতার বীণায়। আহার্যও প্রত্যেকটি হয়েছিল মনের মতো। দারা তাঁর পিতার রুচি তো জানতেনই—ভাইদেরও

* মেহমানী সৌজন্যের নিয়ম হল অতিথি যদি বিশেষ সম্ভ্রান্ত বা গুরুজন-স্থানীয় কেউ হন তো গৃহস্বামী তাঁর জন্য স্বহস্তে দস্তরখান অর্থাৎ বসে আহার করবার চাদর কি জাজিম পাতবেন। মেহামানদারী বা অতিথি সৎকারের কাজে এইটিই চূড়ান্ত ভব্যতা বা তরবীয়তের নিদর্শন বলে গণ্য হয়।

বাবুর্চিখানায় লোক পাঠিয়ে জেনে নিয়ে প্রত্যেকের মনের মতো একটা দুটো পদ তৈরী করিয়েছিলেন। ভোজনরসিক শাহ্‌জাদা শুজা পর্যন্ত মানতে বাধ্য হলেন যে, দারার এ আয়োজন সব দিক দিয়েই বাদশার উপযুক্ত হয়েছে। এদিক দিয়ে অন্ততঃ শাহী তখ্‌তে বসবার যোগ্যতা ধরেন তিনি।

উৎসব ও প্রসন্নতার আমেজ লেগেছিল উপস্থিত সকলকারই মনে। কিন্তু সে আমেজ একটা কঠোর এবং রূঢ় আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল একেবারে এই বিশ্রামের সময়।

এদেশে সকলেই গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে মাটির কাছাকাছি আসতে চায়, জননী মৃত্তিকার স্নেহার্দ্র স্নিগ্ধ স্পর্শ চায়—সজল শীতল প্রশ্রয় খোঁজে তাঁর কোলে। সাধারণ লোক যারা, তারা একতলায় এসে থাকে, মাটি কি পাথরের মেঝেতে জল ঢেলে তাতে গড়ায়। ধনী ব্যক্তিরা তারও নিচে নামেন, প্রত্যেকেই মাটির নিচে একটা মহল—নিদেন পক্ষে একখানা ঘর তৈরী করিয়ে রাখেন দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামের জন্য। প্রাসাদের তো অঙ্গই এটা, তেমন তেমন ক্ষেত্রে মাটির নিচেও দুইতলা-তিনতলা পর্যন্ত নেমে যায়। আগ্রার প্রাসাদ দুর্গে এরকম তিনতলা অবধি আছে। বাদশা স্বয়ং তৈরী করিয়েছিলেন, সে তহ্‌খানা।

শাহ্‌জাদা দারার এই নবনির্মিত আবাসভবনেও যে সে ব্যবস্থার ত্রুটি থাকবে না—তা বলাই বাহুল্য। নদীর ধারে জলের রেখার নিচে শ্বেতমর্মরে নির্মিত এই তহ্‌খানা দারুণ গ্রীষ্মেও কাশ্মীরের মধুর শৈত্য স্মরণ করিয়ে দেয়।

এ সব বাড়ির তহ্‌খানা মানে একটি স্বতন্ত্র অট্টালিকা। সেই রকমই বিশাল ও প্রশস্ত। এখানে বাসকক্ষে বা আশ্রয়কক্ষে কিছু স্বাতন্ত্র্যও বজায় রাখা হয়। মালিক, তাঁর নিকট আত্মীয় এবং সমপর্যায়ের মেহ্‌মানদের জন্য একরকম—আশ্রিত প্রতিপালিত পোষ্য পরিজন এবং পরিচারকদের জন্য আর এক রকম। এ প্রাসাদেও

সে রীতির ব্যতিক্রম হয় নি। দুপাশে দুটি মহল—একটি পরিচারক-আশ্রিত-পোষ্যদের জন্য, একটি তা থেকে কিছু উচ্চ শ্রেণীর আত্মীয়-স্বজনদের জন্য। এই দুইয়ের মাঝখানে ছোট অথচ নানা রকম আরামদায়ক ব্যবস্থায় পূর্ণ—শাহ্‌জাদার নিজের মহল। তাঁর খাসমহল থেকে সিঁড়ি নেমে গেছে এ মহলের—সাদা পাথরের সিঁড়ি, দুদিকের দেওয়ালও সাদা পাথরে ঢাকা। সিঁড়ির শেষে একটি নিরেট নিরন্ধ্র ভারী লোহার এক-কপাট দরজা তার ওদিকে একটা অলিন্দ বা চলন—চলনের ওপারে সারিসারি তিন চারখানা ঘর। এ ঘরগুলোর সব ক'খানাই একেবারে জলের মধ্যে বা জলের তলায়। আশ্চর্য নির্মাণ-কৌশলে শত শত মণ জলের ভার ধরে রাখা হয়েছে ইঁটের খিলানে। সে খিলান অবশ্য নিচে থেকে দেখা যায় না; যাতে দেখা না যায়, সেই ব্যবস্থাই করতে হয়েছে অনেক যত্ন ক'রে—কারণ তাতে একটা আতঙ্কের ভাব মনে জেগে বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটতে পারে, মনে হতে পারে এই কটা ইঁটের ব্যবধান যদি ভেঙ্গে খসে পড়ে—মুহূর্তে সলিল-সমাধি হয়ে যাবে। সে কল্পনার বিন্দুবাষ্পও যাতে না বিশ্রামার্থীর মনে আসতে পারে, সে জন্য অনেক কিছু করতে হয়েছে স্থপতিকে। ঘরে শুয়ে ওপরদিকে চাইলে সাদা পাথরের ওপর কালো লাল ও হলদে রঙের ফুল ও লতাপাতা-কাটা ছাদ ছাড়া কিছুই দেখা যাবে না। অন্যান্য সাধারণ ছাদের মতোই।

এ অংশেও ঘর একাধিক। দালানও বেশ প্রশস্ত, দালানের প্রান্তে হামাম গোসলখানা কিছুরই ত্রুটি বা অভাব নেই। এ মহলের বদ্ধ বাতাস বার করার ব্যবস্থাও ঐখানে—হামামের চৌবাচ্চা ভর্তি জলের উপর দিয়ে কয়েকটি সর্পিল সরু পথ নলের মতো—ভেতরের দূষিত বাতাস যাওয়া ও ওপরের টাটকা বাতাস আসা—দুটো কাজই জলের ওপর দিয়ে হয়ে থাকে, ফলে ভেতরের আবহাওয়া গরম হওয়ার সুযোগ ঘটে না কখনই।

এই সুন্দর সুসজ্জিত সুবিন্যস্ত বিস্তৃত মহলের প্রবেশ পথ কিন্তু একটিই। ওপর থেকে নিচে নামা বা নিচে থেকে ওপরে ওঠার একটিই সিঁড়ি। মানুষ গতায়াতের পথ বেশী থাকলে গরম হাওয়াকেও ঠেকানো কঠিন। তাই যতদূর সম্ভব সে পথ বন্ধ করা হয়েছে। সিঁড়ির দুই মুখও দুটি মজবুত দরজা দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে, ওপর থেকে নামবার মুখে একটা—সেটা সাধারণ চন্দন-কাঠের তৈরী; আর নিচে মহলের প্রবেশ পথে আর একটা। এই দরজাটাই দেখবার মতো। দুদিকে পুরু ভারী ইস্পাতের চাদরে ঢাকা, আসল কপাটটা হল ঘনসম্বদ্ধ মোটা লোহার শিকে তৈরী। যেমন ভারী তেমনি পুরু কপাট। নিশ্ছিদ্র নিরেট। যখন বন্ধ হয় তখন এমনভাবে দেওয়ালের খাঁজে আটকে যায় যে, এক বিন্দু বাতাসেরও ভেতরে যাওয়ার পথ থাকে না। এ ছাড়া উপায়ই বা কি, ওপরের উষ্ণ বাতাস ভেতরে ঢুকলে তো এত আয়োজন সবই মাটি।

দরজাটার আরও কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল।

এমন মসৃণ এর চালনা ব্যবস্থা, এত সুন্দর এর কব্জা যে একটি আঙ্গুলের সামান্য টিপেই খোলে ও বন্ধ হয়—এতটুকু গায়ের জোর দিতে হয় না। আর দুটো কাজই চলে নিঃশব্দে—কোন রকম ধাতব শব্দ ওঠে না।

আরও বৈশিষ্ট্য, কপাটের ইস্পাতের ওপর সাদা রঙ করা হয়েছে দুপাশের শ্বেত পাথরের ঈষৎ নীলাভ রঙের সঙ্গে মিলিয়ে। বন্ধ থাকলে দরজা বলে বোঝাই যায় না, মনে হয় এটাও দেওয়াল। শুধু তাই নয়, চাবি দেওয়ার জায়গাটাও এমন আশ্চর্য কৌশলে ঢেকে রাখা হয়েছে যে, দারা তার মুখ সরিয়ে কুঞ্জী বা চাবি পরানোর আগে পর্যন্ত মসৃণ কপাটের অন্য অংশের সঙ্গে সেই অংশটুকুর বিন্দুমাত্র পার্থক্য বোঝা যায় নি।......

এমনিতেই তো প্রাসাদে পা দেওয়ার পর থেকেই—ওঁরা এর নির্মাণ কৌশলের প্রশংসা ক'রে ক'রে প্রায়-ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন,

এখন তহ্‌খানায় ঢোকার মুখেও তাব ব্যতিক্রম ঘটল না। বিশেষ ক'রে এই দরজার কায়দা দেখে সবাই ধন্য ধন্য ক'রে উঠলেন। বার বার বাহবা দিলেন এর পরিকল্পনাকারী– অর্থাৎ এই হর্ম্যের মালিককে।

এঁদের সে মুখর প্রশংসায় প্রসন্ন হবারই কথা শাহ্‌জাদা দারা শুকোর। আর তা হলেনও তিনি। তাঁর সুগৌর মুখ খুশিতে রক্তাভ হয়ে উঠল, তিনি কপাটটা খুলে ধরে বিনত অভিবাদনের ভঙ্গিতে মাথা নত ক'রে দাঁড়ালেন। মহামান্য অতিথিদের ভিতরে প্রবেশের অগ্রাধিকাব, তাঁরা আগে গেলে তবে তিনি ঢুকবেন!

ঢুকলেনও সবাই। শাহানশাহ্, তাঁর উজীর-এ-আজম, খাবাস, অঙ্গ-সংবাহনের জন্য তাতারী বাঁদী—সে আগে থেকেই ভেতরে ঢুকে পাথরের মূর্তির মতো দেওয়াল ঘেঁষে হেঁট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এঁদের পর ঢুকলেন শাহ্‌জাদা শুজা ও শাহ্‌জাদা মুবাদ, সঙ্গে পা টেপার জন্য দুটি বালক ভৃত্য। এঁরা কপাটের ওপারে পৌঁছে স্মিতমুখে ফিরে দাঁড়ালেন তৃতীয় শাহ্‌জাদার জন্য। এখনও পর্যন্ত ভিতরে আসেন নি একমাত্র তিনিই, আর আসে নি তাঁর ব্যক্তিগত কিশোর ভৃত্যটি—তাকে কোন্ নিঃশব্দ ইঙ্গিতে কখন সরিয়ে দিয়েছেন, কাছাকাছির মধ্যে তার কোন অস্তিত্ব নেই। হয়ত সে এ বাড়ি ছেড়েই চলে গেছে—।

শুধু যে আসেন নি তা-ই নয়, আসবার ইচ্ছাও বিশেষ আছে বলে মনে হ'ল না শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজেবের ভাবভঙ্গী দেখে। তখনও তিন চার ধাপ উঁচুতে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি; স্থির হয়ে পাশের দেওয়ালে সাদা পাথরের ওপর রঙীন পাথরের মীনার কাজ লক্ষ্য করছেন।......

শাহানশার এই পুত্রটির মুখের দিকে তাকিয়ে কোন কালেই ওঁর মনের কথা বোঝা যায় না—আজও গেল না। সেই চিরাভ্যস্ত ভাবলেশহীন মুখ ভ্রূকুটিশূন্য প্রশান্ত ললাট। কেবল দারার মনে হ'ল

—ওঁর দৃঢ়সম্বদ্ধ ওষ্ঠাধরের প্রান্তে ঈষৎ, অতি ক্ষীণ একটু বিদ্রূপের আভাস।

দারা কী ভাবলেন ওঁর এই ভব্যতার-রীতিবিরুদ্ধ নিশ্চিন্ত ঔদাসীন্য দেখে, এই বেয়াদবিতে রুষ্ট হলেন কিনা—তা তাঁরও আচরণ বা বাক্যে প্রকাশ পেল না। আজ সকাল থেকেই তিনি আদর্শ গৃহ-স্বামীর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, এখনও সেই ভাবই বজায় রাখলেন। অতি মোলায়েম প্রীতি-মধুর কণ্ঠে ডাকলেন 'এসো ভাইসাহেব, আমরা দাঁড়িয়ে আছি তোমার জন্যে।'

আওরঙ্গজেব যেন বিষম ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বার বার মাথা হেঁট ক'রে উপস্থিত সকলকে অভিবাদন জানিয়ে বললেন, 'ইস্, বড়ই গুস্তাকী হয়ে গেছে, আমি যে আপনাদের বলতেই ভুলে গেছি—সেটাই আমার ইয়াদ ছিল না। আপনারা যান শাহ্জাদা, বিশ্রাম করুনগে। আমার নসিবে আপনার এই বেহেস্তী তহ্খানায় আরাম করার সুখ নেই। আমার একটা জরুরী কাজ পড়ে গেছে—খুবই জরুরী, সেজন্যে আমাকে এখনই আমার গরিবখানায় ফিরতে হবে।'

'সে কি! এই দুপুর রোদে! ঝলসে যাবে যে!'

দারা কোন উত্তর দেবার আগেই শুজা বলে ওঠেন।

ঈষৎ অবজ্ঞার হাসি দেখা দেয় আওরঙ্গজেবের ওষ্ঠপ্রান্তে। অবজ্ঞা আর তার সঙ্গে একটু বিদ্রূপও থাকে সে হাসিতে। সকলেই বলে এই হাসি তৃতীয় শাহ্জাদাকে যেমন মানায় এমন আর কাউকে নয়। এই হাসি হাসবার সময় তাঁর ওপরের ঠোঁটটিতে কেমন একটা কুঞ্চন দেখা দেয়, সামান্য একটু বিকৃত হয়ে ওঠে—কিন্তু তাতেই যেন ওঁকে আরও সুন্দর দেখায়। সুন্দর- কিন্তু সে সৌন্দর্য মনে একটা আতঙ্কেরও সঞ্চার করে, মনে হয় এ হাসি যে হাসতে পারে, তাকে সাধারণ মানুষের কোন গুণ, কোন হৃদয়াবেগই বোধ হয় স্পর্শ করে না। উনি যখন এই হাসি হাসেন, তখন উপস্থিত অন্য মানুষরা যেন নিজেদের কেমন ছোট মনে করেন ওঁর কাছে। এই হাসি দেখে

নাকি এক বাঁদী—এক রাত্রির নর্মসহচরী এক বিদেশিনী—বহুদিন আগে ওঁকে বলেছিল, 'বিধাতা যে আপনাকে বাদশা হবার সনদ দিয়ে পাঠিয়েছেন এই দুনিয়ায়—ঐ হাসিই তার প্রমাণ!'

কথাটা ভোলেন নি শাহজাদা।

বোধ করি ভুলতে পারেন নি। মনের মধ্যেকার কোন্ একটি অব্যক্ত অস্ফুট গোপন আশার তন্ত্রীতে ঘা দিয়ে গিয়েছিল কথাটা।

তাই আজকাল এই হাসি হাসবার সঙ্গে সঙ্গে সচেতন হয়ে ওঠেন। আজও হয়ে উঠলেন।

বোধ করি সচেতন হওয়ার আরও কারণ ছিল। কারণ—কোনও তীক্ষ্ণদৃষ্টি লোক সেখানে উপস্থিত থাকলে লক্ষ্য করত—তাঁর দুটি কান ও তার কাছাকাছি কপোলের খানিকটা রক্তাভ হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গেই।

তবে তা উপস্থিত কারও লক্ষ্য করার কথা নয়, করলও না কেউ। শুধু হাসিটাই দেখল সকলে, আর মনে মনে—সম্পূর্ণ অকারণেই কুণ্ঠিত হয়ে উঠল।...

আওরঙ্গজেব তাঁর সেই অননুকরণীয় তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেন, 'রোদের তাতে ঝলসে যায় শাহী হারেমের আরামে অভ্যস্ত মেয়েরা আর মোটা বানিয়ারা। যাদের খেটে খেতে হয়—বিশেষত পুরুষদের মুখে একথা মানায় না। আপনাদের অনুচররা, কর্মচারীর—বিশেষ ক'রে সাধারণ প্রজারা শুনলে লজ্জা পাবে, আপনাদের উপহাস করবে। এখন পথে বেরোলে দেখবেন বহু স্ত্রী-পুরুষ তাদের অভ্যস্ত কাজ ক'রে যাচ্ছে, পথ একেবারে জনহীনও নয়। আপনি নিজে তো বিখ্যাত যোদ্ধা, অভিজ্ঞ সেনাপতি—প্রয়োজন হ'লে আপনি দ্বিপ্রহরে যুদ্ধযাত্রা করবেন না?...আমাদের প্রপিতামহ শাহানশাহ্ আকবর শাহ্ শুনেছি জ্যৈষ্ঠ মাসের গরমেও দিনে রাতে কোথাও না থেমে এক দণ্ডও বিশ্রাম না নিয়ে একটানা রাজোয়ারার মরুভূমি পার হয়ে এই আগ্রায় এসেছিলেন। ঘোড়া

মরেছিল অনেক—কিন্তু তাঁর শরীর খারাপ হয় নি। একথা নিশ্চয় আপনিও শুনেছেন শাহ্‌জাদা, আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে যাওয়া বাহুল্য মাত্র!'

অপমানে শুজার মুখ অঙ্গার-বর্ণ ধারণ করল কিন্তু দেখা গেল যে স্বয়ং শাহান্‌শাহও এই ধৃষ্টতায় কম ক্রুদ্ধ হন নি। বার বার আরামের ইঙ্গিত এবং আকবর শার সঙ্গে তুলনাটা তাঁর গায়ে লাগল কিনা কে জানে, তিনি অসহিষ্ণুভাবে পাথরের মেঝেতে পা ঠুকে (তহ্‌খানার মেঝেতে গালিচা পাতার রেওয়াজ নেই, পাথরের হিমস্পর্শই সুখদ বলে বিবেচিত হয় এখানে) বলে উঠলেন, 'আঃ, এই পথের মাঝে দাঁড়িয়ে কী শুরু করলে তোমরা? আওরঙ্গজেব, তোমার ও খুব জরুরী কাজ, আশা করছি ঢু তিন ঘণ্টা বিলম্বে এমন কিছু পণ্ড হবে না। তুমি আপাততঃ দয়া ক'রে ভেতরে এসে দরজাটা বন্ধ করতে দাও।…শুধু শুধু—বাজে কথা কয়ে দেরি করছ মাঝখান থেকে গরম হাওয়া খানিকটা ঢুকে যাচ্ছে এখানে। আরও কিছুক্ষণ কপাটটা খোলা থাকলে এত আয়োজন সব মাটি হয়ে যাবে!'

'আমার আপরাধ হয়ে গেছে শাহানশাহ্‌, বিস্তর অপরাধ হয়ে গেছে। শাহ্‌জাদা দারা অনুগ্রহ ক'রে এখনই কপাট বন্ধ ক'রে দিন—আমার জন্য অনর্থক বিলম্ব করবেন না।……আমাকে সত্যিই একবার বাড়ি যেতে হবে এখনই!'

অকস্মাৎ সকলকে চমকে দিয়ে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠলেন বাদশা, 'না, হবে না। আমি বলছি হবে না। আর এ রাজ্যে তা-ই যথেষ্ট। কাজ মানে তো আমারই কাজ, পণ্ড হয় আমি বুঝব।…ভেতরে চলে এসো বলছি, অবাধ্য বেয়াদব ছেলে।'

এ সরোষ কণ্ঠস্বর, এই পদদাপ অনেক দিন শোনেন নি শাহ্‌জাদারা, তাঁরা সকলেই চমকে উঠলেন। এ কণ্ঠস্বরের সামনে বড় বড় সুবাদার, বড় বড় যোদ্ধাদের কেঁপে উঠতে দেখেছেন তাঁরা, দশহাজারী মনসবদারদের ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যেতে দেখেছেন। এর

পরবর্তী আদেশ কি তাও জানা আছে সকলের। এর পরই কোতলখানায় নিয়ে যাবার আদেশ বার হয় শাহী কণ্ঠ থেকে। ছেলের বেলায় হয়ত এতটা হবে না; তবুও সকলেই—একমাত্র শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজেব ছাড়া—একবার নিজেদের অজ্ঞাতসারেই নিজেদের গলায় হাত বুলিয়ে নিলেন। যেন, ধড়ের ওপর শিরটা এখনও আছে কিনা যাচাই ক'রে নিলেন একবার।

শুধু শাহানশাহের তৃতীয় পুত্রটিই বিচলিত হলেন না তেমন, যেখানে ছিলেন সেখানেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কেবল, যেন রাজকীয় রোষ মাথা পেতে নিয়ে সম্মান দেখানো উচিত বলে, সামনের দিকে আরও অনেকখানি ঝুঁকে হেঁট হয়ে দাঁড়ালেন।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন সকলে।

মায়, স্বয়ং সম্রাট পর্যন্ত।

এতখানি দুঃসাহস যে কারও থাকা সম্ভব, এতখানি ধৃষ্টতা যে কেউ কোনদিন বাদশার সামনে প্রকাশ ক'রেও স্থির অচঞ্চল থাকতে পারে—তা চোখে দেখেও বিশ্বাস করা কঠিন যে।

তিনি কি জেগে আছেন?

তিনি কি জীবিত এখনও?

না কি, এ সমস্তটাই খোয়াব দেখছেন?

এই বাড়ি, এই তহ্‌খানা—কিছু পূর্বের উপাদেয় খাদ্য-সামগ্রী—এর কোনটাই কি বাস্তব কিছু নয়? এখনই, ভোরাই-নাকারার শব্দে এবং ফজরের আজানে ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠে দেখবেন—তিনি তাঁর শয়নকক্ষেই অবস্থান করছেন, এতক্ষণ গাঢ় ঘুমে অচেতন ছিলেন মাত্র।

অথবা তাঁর বাদশাহীই আর নেই! পিতৃপিতামহের শাহী-তখৎ—শাহানশাহ্‌ বাবর-আকবরের সিংহাসনে তাঁর কোন অধিকার নেই। লক্ষ লক্ষ সিপাহী-সান্ত্রী, মনসবদার-নবাব-রাজা, উজীর-সুবাদার—কোন্ সুদূর দিগন্তে লুপ্ত হয়ে গেছে, মিলিয়ে গেছে

প্রত্যূষের পশ্চিমাকাশে বিলীয়মান শেষ নক্ষত্রটির মতো, ভোরের ঘুম ভাঙ্গা সুখ-স্বপ্নের মতো!

কিম্বা, সৃষ্টির শেষ দিনটিই বুঝি আসন্ন, সারা জাহানের আখেরী মুহূর্তটি। মানুষের গুনাহ্ আর গোস্তাকিতে, স্পর্ধা আর ধৃষ্টতায় নারাজ হয়ে জগদীশ্বর বুঝি আজই স্মরণ করেছেন ইস্রাফিলকে—দুনিয়ার এই খেলাঘরটাকে ভেঙ্গে দেবার জন্য। এখনই বুঝি মাটি কেঁপে উঠবে, পাহাড় ভেঙ্গে পড়বে, নদীর উৎস যাবে শুকিয়ে, উন্মত্ত সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাসে এই সব শহর, গ্রাম, জনপদ ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে! আর, সেই চরম সর্বনাশ আসন্ন জেনেই সবাই এমন বেপরোয়া হয়ে গেছে। শাহানশাহ্ বাদশা শাহ্জাহানের স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ আদেশ অমান্য ক'রেও সামান্য একটা প্রাণী এমন স্থির ও নিশ্চিন্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে।...

বিস্ময়! বিস্ময়! এর চেয়ে সোজাসুজি বিনা ভূমিকম্পে একটা পাহাড় ভেঙ্গে পড়তে বা নদীর জল ঊর্ধ্বগামী বইতে শুরু করেছে দেখলেও এঁরা বোধ হয় বেশী বিস্মিত হতেন না।

তাই বেশ কিছুটা সময় লাগল এঁদের—বোধ, চৈতন্য এবং অনুভূতি শক্তি ফিরে পেতে। তার পরও—চিন্তা-শক্তি সক্রিয় হয়ে বাস্তব অবস্থাটা অনুভব করতে, আরও অনেকখানি সময় লাগল। তখন—বাদশার মুখের দিকে সভয়ে—আনত মুখে দাঁড়িয়ে যতটা দেখা সম্ভব—চেয়ে দেখল সকলে যে, তাঁর শুভ্র সুগৌর মুখ সত্য-সত্যই অঙ্গারবর্ণ ধারণ করেছে, ঈষৎ নীল চক্ষু দুটি জবা ফুলের মতো লাল হয়ে উঠেছে, ললাটের দুদিকে শিরাগুলো আনীল রক্তাভ দড়ির মতো মোটা হয়ে ফুলে উঠেছে।

অর্থাৎ তাঁর দেহের সমস্ত রক্ত, তৈমুরশাহী বাবরশাহী বংশের স্বভাব-উত্তপ্ত লোহু প্রবল বেগে মাথায় উঠছে, হয়ত এখনই শির ছিঁড়ে নাকমুখ দিয়ে বা দুই চক্ষু বিদীর্ণ ক'রে সে রক্ত বেরিয়ে আসবে; অথবা সন্ন্যাস রোগে এখনই অচৈতন্য হয়ে পড়ে যাবেন!

উজীর-এ-আজম ব্যাকুলভাবে একবার চারদিকে চাইলেন। ভুল হয়ে গেছে, খুবই ভুল হয়ে গেছে তাঁদের। সবাইকে আনা হয়েছে সঙ্গে, শুধু হাকিম সাহেবের কথাই মনে পড়ে নি। কিন্তু এখানে কি কেউ নেই? শাহ্‌জাদা দারার কোন চিকিৎসক? শাহ্‌জাদা তাঁকে ডাকছেন না কেন?

তিনি কী যেন একটা বলতেও চেষ্টা করলেন, হয়ত শাহ্‌জাদা দারাকে হাকিম ডাকবার কথাই বলতে গেলেন, কিন্তু সে চেষ্টার ফলে তাঁর ঠোঁট দুটোই শুধু নড়ল, তার মধ্য দিয়ে কোন শব্দ বার হ'ল না। বাদশার মুখের দিকে চেয়ে আসন্ন একটা প্রলয়কাণ্ডের আশঙ্কায় তাঁর কণ্ঠ তালু সমস্ত শুকিয়ে গিয়েছিল, রসনা হয়ে গিয়েছিল অসাড় অনড়—কথা ফোটা তো দূরের কথা, কোন ধ্বনি বার হবারও অবস্থা ছিল না।

কিছুই করতে না পেরে—মনে মনে শুধু খোদাকেই স্মরণ করতে লাগলেন তিনি।

কিন্তু না, কোন প্রলয়ঙ্কর কিছু ঘটল না। মাথার ওপরের ছাদ তার বিপুল কালো জলের বোঝা নিয়ে ভেঙ্গে পড়ল না কিংবা পায়ের তলার পাথর বিদীর্ণ হয়ে একটা বিরাট অগ্ন্যুৎপাতের সৃষ্টি করল না। এমন কি বাদশাও উন্মত্ত রোষে ফেটে পড়ে উপস্থিত সকলের গর্দান নেবার আদেশ দিলেন না। বরং যেন অমানুষিক চেষ্টায় সেই দুর্বার ক্রোধকে দমনই করলেন শেষ পর্যন্ত। এটাও বাদশাহীর একটা প্রধান শিক্ষা, পিতৃপিতামহের রক্ত থেকে প্রথম জীবনানুভূতি লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই এই শিক্ষাটুকুও সংগ্রহ করেন তাঁরা। শাহ্‌জাহানও সে শিক্ষা লাভ ক'রে আসছেন, তাঁর শৈশব থেকে। চিত্ত দমন করা ও মনোভাব গোপন করার শিক্ষা। বহু পুরুষের শাহী রক্ত বইছে তাঁর ধমনীতে – চেঙ্গিজ খাঁ-তৈমুরলঙ্গ থেকে বাবর শা-আকবর শা—দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ও শ্রেষ্ঠ শাসকের রক্ত; সেই রক্তেরই শিক্ষা এটা।

সাধারণ মানুষের যে সহজাত ক্রোধ, কিছুকালের জন্য তা দুর্মদ হয়ে উঠেছিল হয়ত—কিন্তু সে নিতান্তই কয়েক মুহূর্তকাল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর শাহানশাহী ঐতিহ্য কঠিন নির্মমভাবে দমন করল তাকে। আস্তে আস্তে ফুলে ওঠা শিরাগুলো মিলিয়ে গেল তাঁর দুই রগের ওপর থেকে, মুখের সেই অঙ্গার ভাব ধীরে ধীরে তার স্বাভাবিক রক্তাভ গৌরবর্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করল। বাদশা তাঁর আপন সত্তায় ফিরে এলেন আবার।

আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, যেন কোন বিজয়-লাভের আত্মতৃপ্তিতেই, তাঁর স্বাভাবিক ঋজুদেহ ঋজুতর হয়ে উঠল, আর একটু সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন—যাতে তাঁর দীর্ঘদেহ আরও বেশী দীর্ঘ দেখায়, পদবীর উপযুক্ত সম্ভ্রমের সৃষ্টি করে উপস্থিত সকলের মনে। তিনি যে উপস্থিত সকলের থেকেই বড়—কী মহিমায়, কী মর্যাদায় আর কী শক্তিতে—সে সম্বন্ধে সংশয় মাত্র না থাকে কারুর।

সম্রাট এবার দরজার দিক থেকে ফিরে একেবারে বিপরীত দিকে মুখ ক'রে দাঁড়ালেন। তারপর গম্ভীর অথচ অনুত্তেজিত ভাবলেশ-হীন কণ্ঠে জানালেন তাঁর আদেশ ও নির্দেশ। বললেন, 'মাননীয় উজীর-এ-আজম, আজ থেকে আমার তৃতীয় পুত্র শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজেবের দরবারে প্রবেশ নিষিদ্ধ হ'ল। সাধারণ দরবারে তো নয়ই—কোন রাজকীয় জুলুস জলসা উৎসব বা ভোজসভাতেও তিনি যোগ দিতে পারবেন না। কোন কারণেই আমার সামনে যেন কোন দিন না আসেন আর। যে সব দায়িত্বভার তাঁর ওপর ন্যস্ত ছিল, দয়া ক'রে তা লাঘব ক'রে দেবেন। কোন কাজই ওঁর ওপর রাখার দরকার নেই। বোধ করি কিছুদিন পূর্ণ বিশ্রাম প্রয়োজন হয়েছে তাঁর– অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁর শরীর খারাপ হয়ে পড়েছে, তাঁর চিন্তা-শক্তিতেও চাপ পড়ছে বেশ বোঝা যায়। ওঁর কোন্ কাজ কী ভাবে কাকে বেঁটে দেবেন—সে ভার আপনার ওপরই দেওয়া রইল। শুধু দাক্ষিণাত্যে আমার প্রতিনিধি হিসেবে অতঃপর

কাকে পাঠানো হবে—সেটা কাল আমার কাছ থেকে জেনে নেবেন। দশহাজারী মনসবও তাঁর থাকছে না—সেটাও মনে রাখবেন। কোন মনসবেই আর প্রয়োজন নেই তাঁর।'

এই পর্যন্ত বলে এক মুহূর্তকাল চুপ করলেন তিনি। বোধ করি আরও কি করা যেতে পারে, আরও কোন্ শাস্তি দিলে এই বেয়াদবির যোগ্য প্রত্যুত্তর হয় ভেবে নিলেন মনে মনে। তারপর বললেন, 'আর—শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজেবের যে মাসোহারা নির্দিষ্ট আছে আজ থেকে উনি তার মাত্র এক-চতুর্থাংশ পাবেন। ঘোড়া গাড়ি বা পাল্‌কী বাবদেও অতিরিক্ত কোন ভাতা দেওয়া হবে না ওঁকে।...আদেশগুলো আপনি এখনই লিপিবদ্ধ ক'রে নিন, ভুল না হয়। আমি আজই অপরাহ্নে বিশ্রামের পর দেখে দস্তখৎ ক'রে দেব। তারপর শাহ্‌জাদা দারাকে দিয়ে পাঞ্জার ছাপ দিইয়ে নেবেন।'

কাটা কাটা পরিষ্কার কথা। কোথাও কোন দ্বিধা কি জড়তা নেই, নেই কোন অস্পষ্টতা। কারও শোনবারও অসুবিধা হ'ল না, কারণ বেশ শ্রুতিগম্য স্বরেই তিনি বলেছেন কথাগুলো। আদেশ শেষ ক'রে আর দাঁড়ালেনও না শাহানশাহ্, দৃঢ় স্বচ্ছন্দ পদক্ষেপে গিয়ে নিজের নির্দিষ্ট কামরায় প্রবেশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর তাতাবী বাঁদী ও খাবাস ভিতরে গিয়ে কামরার প্রবেশপথের সামনেকার ভারী পর্দাটা ফেলে দিয়ে দরজা আবৃত ক'রে দিল। ঘরে সুগন্ধি তেলের শেজ জ্বলছে, বাইরের আলোর কোন প্রয়োজন নেই।

কিন্তু, শুধু তিনিই গেলেন, আর তাঁর সেবকরা গেল। আর কেউই নড়ল না। বহুক্ষণ পর্যন্ত নড়তে পারল না। স্থির নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সবাই—যে যেখানে ছিল। বজ্রাহতের মতো স্তম্ভিত অবস্থা তাদের, না আছে হাত-পা নাড়ার সাধ্য—না আছে কথা কইবার। এমন কি উজীর-এ-আজমও—যাঁকে সম্বোধন করে এই ভয়ঙ্কর আদেশ জানানো হ'ল—কোন কথা কইতে পারলেন না।

এক্ষেত্রে অন্ততঃ যেটুকু শব্দ করা প্রয়োজন, আনুগত্য ও সম্মতিসূচক, সেটুকুও তাঁর গলা দিয়ে বেরুল না। শুধু সেই বোধ করি, সূচীপতন-শব্দহীন নিস্তব্ধতার মধ্যে বাদশারই ভারী ভরাট গলার উচ্চারিত শব্দগুলো অনেকক্ষণ ধরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগল। বাদশা যেখানে উপস্থিত, সেখানে মাত্র তাঁর কণ্ঠই সরব ও সক্রিয় থাকবে —এই সত্য প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল আজ।

নিঃশব্দ ও নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজেবও —কিন্তু সে এঁদের মতো বিস্ময়ে বা ভয়ে নয়। তাঁরও স্তম্ভিত অবস্থা—তবে সে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাকৃত, যেন কতকটা তাঁর রাজাধিরাজ পিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যই। বিনা প্রতিবাদে বিনা দ্বিধায় মাথা পেতে নিচ্ছেন পিতার অসন্তোষ ও আদেশ—সেইভাবেই মাথা হেঁট ক'রে রইলেন। তাঁর মুখ দেখে মনে হ'ল না তিনি কিছুমাত্র অনুতপ্ত বা বিচলিত হয়েছেন। বরং সে সময় যদি ভাল ক'রে কেউ লক্ষ্য করতেন ওঁর মুখভাব, তাঁদের মনে হ'ত যে অতি ক্ষীণ, প্রায় অদৃশ্য একটি হাসির রেখাই ফুটে উঠেছে তাঁর দুই ওষ্ঠপ্রান্তে। সে হাসির অর্থ কী—তা অবশ্য কেউ বলতে পারতেন না। সে কি উপেক্ষা? সে কি স্পর্ধা? সে কি বিদ্রূপ?—নাকি শুধুই এক প্রকারের স্নেহমিশ্রিত প্রশ্রয়—শিশুর আস্ফালন দেখলে গুরুজনরা সেটাকে যেভাবে নেন তেমনিই?

কী সে—তা বোঝা গেল না। বুঝতে দিলেনও না শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজেব। শাহানশার উপস্থিতি যবনিকার অন্তরালে অন্তর্হিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন তিনি। যেন কিছুই হয় নি, যেন বাদশা আর কারও সম্বন্ধে কইলেন কথাগুলো—এইভাবেই খুব সহজে স্বগৃহে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন।

ভয় নেই, দুশ্চিন্তা নেই—তাই বলে দুর্বিনয়ও নেই। সৌজন্যের রীতি প্রকাশে কখনও ভুল হয় না তাঁর। শুজা ও মুরাদের উদ্দেশে একটু মাথা হেলিয়ে তাঁদের অভিবাদন জানালেন, উজীর-এ-আজমের

দিকে একটু হাসি এবং সম্মানসূচক একটা ভঙ্গী যেন ছুঁড়ে দিলেন—তারপর অতি মধুর বিনয়ের সঙ্গে গৃহস্বামীর দুই হাত ধরে বিদায় প্রার্থনা জানিয়ে ধীর পদক্ষেপে উপরের দিকে উঠে গেলেন।

এদের কী রকম মনোভাব বা মুখভাব হ'ল তা দেখার জন্য যেমন এক মুহূর্তও আর অপেক্ষা করলেন না—তেমনি পিছনের ভারী দরজাটা যে নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল তাও লক্ষ্য করলেন না আর।

॥ ৩ ॥

বজরায় এসেছিলেন অথবা বলা যায় বজরা তাঁর পিছু পিছু এসেছিল—কিন্তু তাতে আর ফিরলেন না শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজেব। তাঁর যা মানসিক অবস্থা এখন—তা ঐ নিষ্ক্রিয় মন্থর জলযাত্রার পক্ষে অনুকূল নয় আদৌ। বিলাস ও আরাম কখনই দেখতে পারেন না তিনি, এখন তো অসহ্য। বজরা চলবে স্রোতের বিপরীত দিকে—প্রায় না চলার মতোই, ধীরে ধীরে—আর তিনি মুখ বুজে বসে থাকবেন চুপ ক'রে, অথবা শুয়ে থাকবেন, এ তাঁর দ্বারা হবে না, অন্ততঃ এখন তো নয়ই। সুতরাং তিনি অগ্রজের নূতন বাড়ির তহ্‌খানা থেকে উঠে এসে সর্বপ্রথমেই যা আদেশ দিলেন তা হ'ল বজরাকে ফিরে যাবার। দারার কর্মচারীরা ব্যস্ত হয়ে তাঁর জন্য তাঞ্জাম বা ঘোড়ার গাড়ির ব্যবস্থা করতে যাচ্ছিল—মধুর ধন্যবাদের সঙ্গে তাদেরও নিরস্ত করলেন।

প্রয়োজনও কিছু ছিল না। তাঁর বালক ভৃত্যকে বৃথাই তিনি আগে সরিয়ে দেন নি ; সে-ই তাঁর ফেরার ব্যবস্থা করেছে তাঁর মনের মতো। তাঁর ঘোড়া আর সেই সঙ্গে জনা আষ্টেক অশ্বারোহী দেহরক্ষী ডেকে এনেছে সে, দারার প্রাসাদের বাইরে অপেক্ষা করছে তারা। আনবে যে—সে কথা আওরঙ্গজেব নিশ্চিত জানেন। এবং

আনবে সে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই। এতক্ষণ পৌঁছে যাবার কথা যখন—তখন পৌঁছেও গেছে। আওরঙ্গজেব প্রশ্ন করলেন না কাউকে, কারুর কাছে খবর নিলেন না—বাইরে এসে দেখলেন ঘোড়া অপেক্ষা করছে, বিনাবাক্যব্যয়ে ঘোড়ায় চেপে নিজের প্রাসাদের দিকে রওনা দিলেন।...

এই ধরনের লোক ছাড়া শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজেবের চলে না। অলস অকর্মণ্য সেবক আর চাটুবাদী পার্ষদকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করেন তিনি। এরাই মানুষের পতনের মূল। এরা মনিবদের শুধু যে অমানুষ ক'রে দেয়, তাই নয়, তাদের সর্বনাশের পথে টেনে আনে। বালক দেলওয়ার শুধু অত্যন্ত অনুগত বা অত্যন্ত প্রিয়দর্শন বলেই নয়—অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও অসাধারণ কর্মঠ বলেই শাহ্‌জাদার এত প্রিয়। ইঙ্গিতে ইশারায় বুঝে নেয় তাঁর মনের কথা, অনেক সময় সেটুকুও করতে হয় না পুরোপুরি। ইচ্ছা বুঝে নিতে পারে এবং ইচ্ছা বোঝামাত্র তা পূর্ণ করতে পারে, অন্ততঃ সে চেষ্টায় এতটুকু বিলম্ব কি গাফলতি হয় না। এই বয়সেই এমন চৌকস এবং কর্মঠ ছেলে তিনি বড় একটা দেখেন নি। পরিশ্রমী বুদ্ধিমান অথচ বিশ্বস্ত। তাঁর সন্দেহ হয়—তাঁকে হয়ত ভালওবাসে। সর্বক্ষণ ছায়ার মতো কাছে থাকে, তাঁর ব্যক্তিগত সেবার খুঁটিনাটি কাজগুলো পর্যন্ত নিজে করে—জোর ক'রেই, খাবাস বা অন্য কোন ভৃত্যকে করতে দেয় না। সেই জন্যেই—এত বয়স্ক লোক থাকতে বহু গুরুতর কাজের ভার তিনি এই কিশোর বয়স্ক সেবকটিকেই দেন নিশ্চিন্ত হয়ে।

আজও দিয়েছিলেন তাই। ইঙ্গিত মাত্র সরে গিয়েছিল সে, সকলের চোখের সামনে থেকে যেন ডুবে গিয়েছিল। আলোতে-আসা-ছায়ার মতোই মিলিয়ে গিয়েছিল। এই রকমই প্রয়োজন ছিল, তা সে বুঝেছে। নইলেই জবাবদিহি, সহস্র কৌতূহলী প্রশ্নের সামনে পড়া। তাতে কার্য সিদ্ধির বিঘ্ন ঘটত। ঠিক সময়ে বেরিয়ে গিয়েছিল, ঠিক সময়ে ফিরেছে। যা করা উচিত ছিল, যা আনা

বা যাদের আনা দরকার—সব এনেছে ঠিকঠিক। ঘোড়া দেহরক্ষী কিছুই ভুল হয় নি।

খুশী হলেন আওরঙ্গজেব কিন্তু মুখে কিছুই বললেন না। কোন বাহবা দেবারও চেষ্টা করলেন না। তিনি জানেন যে, এক্ষেত্রে অন্তত, মৌখিক প্রশংসার কোন প্রয়োজন নেই। মালিক খুশী হলেন কিনা—তাও দেলওয়ার তাঁর মুখ দেখেই বুঝতে পারে।

দেহরক্ষীরা শাহ্‌জাদাদের আমীরদের আগে পিছে চলবে—এই তাঁদের কর্তব্য ও দায়িত্ব, কিন্তু আওরঙ্গজেব আজ আর তাদের সে কর্তব্য পালনের অবসর দিলেন না। বোধ করি রেকাবে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার ক্ষমতা বুঝতে পারলেন, ঘোড়াও পিঠে বসার সঙ্গে সঙ্গে চিনল সওয়ারীকে—দেখতে দেখতে দেহরক্ষীদের বহু পিছনে ফেলে এগিয়ে চলে গেল। তাদের সাধারণ ঘোড়ার সাধ্য নেই যে শাহ্‌জাদার শিক্ষিত আরবী ঘোড়ার সঙ্গে সমান চাল বজায় দেয়। সুদ্ধ মাত্র বালক দেলওয়ার কোনওমতে—প্রাণপণ চেষ্টায়, কতকটা কাছাকাছি চলতে লাগল। তাও ঘোড়ার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে, তার সাধ্যাতিরিক্ত দ্রুত চালিয়ে।

তা হোক, দেহরক্ষীর প্রয়োজন নেই আওঙ্গজেবের। ওটা নিতান্তই সম্মানের প্রশ্ন মাত্র। ভয় তিনি কাউকে করেন না, একমাত্র বে-নিয়াজ জগদীশ্বরকে ছাড়া। এখানের কাউকেই ভয় নেই তাঁর। এ শহরে এমন কেউ নেই যে তাঁর অনিষ্ট করতে সাহস করবে। তাছাড়া ঈশ্বর তাঁকে এমনই ব্যক্তিত্ব দিয়েছেন, ইন্দ্রিয়গুলি এমনই সজাগ ও সতর্ক ক'রে পাঠিয়েছেন এ পৃথিবীতে যে, বিপদ কোনদিক থেকে আসছে তা চোখে না দেখেও টের পান তিনি। আর সে কথা জানেও পরিচিত সবাই। তাঁর ভাইরাও জানে। তাদেরও ভরসায় কুলোবে না এভাবে তাঁকে বিপন্ন করার। আর এই দুপুরে দুঃসহ অগ্নিতাপে সকলেই ঘরের কোণে অর্ধ-মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছে। যাদের বিশেষ কাজে বাইরে থাকতে হয়েছে, তারা তো মৃতপ্রায়,

কোন রকমে কাজ সেরে ছায়ায় কোথাও যেতে পারলে বাঁচে। পথ দিয়ে কে যাচ্ছে ঘোড়ায় চেপে তা দেখার সময় বা অভিরুচি কিছুই নেই।

কষ্টকর খুবই, তবু এই মুহূর্তে আওরঙ্গজেবের যেন এই কষ্টটাই ভাল লাগল। এর চেয়েও দৈহিক কষ্ট বোধ করতে পারলে যেন তিনি সুস্থ বোধ করতেন। আর কিছু না হোক—দ্রুত চলতে পেয়ে বেঁচে গেলেন খানিকটা, এই দ্রুতগতিই যেন রসায়নের কাজ করল।

প্রাসাদের ফটক সুদ্ধ পেরিয়ে গিয়ে একেবারে সিঁড়ির মুখে ঘোড়া থেকে নামলেন শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজেব। লাগামটা দেলওয়ারের উদ্যত ও সদাপ্রস্তুত হাতের উদ্দেশে ছুঁড়ে দিয়ে তরতর ক'রে ওপরে উঠে গেলেন—নিজের মুন্সীখানায়। এখনও মধ্যাহ্ন কাটে নি, তহ্‌খানায় খস্‌খস্‌ সুরভিত শীতল ঘরে পূর্ববঙ্গ থেকে আনা শীতলপাটি বিছানো শীতলতর শয্যা এখনও অপেক্ষা করছে তাঁর জন্য। পাশে ফুলের মালা জড়ানো সুরাইতে হিমশীতল জল এবং শয্যার উপর খস্‌খসের টানা পাখা সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছে এখনও—এসব কোন কথাই মনে পড়ল না তাঁর। আশপাশে যে সন্ত্রস্ত খাবাস ও খানসামার দল ছুটে এসেছে, তাতারিণী ও খোজা প্রহরীর দল উন্মুখ হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আছে আদেশের জন্য—সেদিকে তাকিয়ে দেখলেনও না একবার। কাজের সুবিধার জন্য দোতালায় মুন্সীখানার পাশে একটি ছোট একক শয়নকক্ষ প্রস্তুত থাকে সর্বদা, প্রয়োজন হ'লে তিনি সেখানেই বিশ্রাম করতে পারবেন। করেনও তা, গুরুতর রাজকার্য থাকলে, এমন কি রাত্রেও এক একদিন এখানেই বিশ্রাম নেন। গভীর রাত্রে কোন স্ত্রীকে ডেকে তুলে তার আলস্য-মদির চক্ষু ও নিদ্রাস্ফীত মুখ দেখার প্রবৃত্তি তাঁর হয় না।···দরকার হ'লে আজও সেই ঘরেই শোবেন। গরম? যে এই দুপুরে এতটা পথ ভেঙ্গে এসেছে তার পক্ষে ঘরের ছায়াই তো যথেষ্ট শীতল। তা

ছাড়া সে যা-ই হোক, এখন ঘুমোবার কথা তো ভাবতেই পারছেন না। মনের মধ্যে চিন্তাগুলোকে একটু গুছিয়ে নেওয়া দরকার।

মুন্সীখানায় ঢুকেও তাঁর অভ্যস্ত আসনে তখনই বসতে পারলেন না শাহ্‌জাদা। মেহগনি কাঠের পালঙ্কে ফরাস পাতা, পাশের একটি উঁচু চৌকিতে বিস্তর কাগজপত্র মানচিত্র প্রভৃতি স্তূপাকার করা, কলম দোয়াতদান—রীতিমতো দফতরের সজ্জা। ফরাসেও একটা বড় উঁচু তাকিয়া আছে, কিন্তু শাহ্‌জাদা তাতে হেলান দেন কদাচিৎ, সোজা হয়ে বসেই কাজ করেন। এত কাজও তাঁর মতো কেউ করতে পারে না—পাঁচ ছ-জন মুনীম ও মুন্সী তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিতে হিমশিম খেয়ে যায়। তবু তো চিঠিপত্র বেশির ভাগ তিনি নিজের হাতেই লেখেন।

ঘরে ঢোকার পরও, অনেকক্ষণ পর্যন্ত, তিনি যে ঘরে ঢুকছেন তা যেন বুঝতেই পারলেন না। সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক ও অনবহিত ভাবেই পায়চারি করতে লাগলেন। এ ঘরেও যে শয্যা আছে একটা—অন্তত তাতে বসা চলে অনায়াসেই—পাশের ঘরে তো শয়নের সব ব্যবস্থাই প্রস্তুত—সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সচেতনতা দেখা গেল না। শুধু হঠাৎ কোথা থেকে খানিকটা বাতাস এসে লাগতে চমকে লক্ষ্য করলেন, দেলওয়ার কখন ঘরে এসে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে ঘরের কোণে রাখা বড় পাখাখানা তুলে নিয়ে বাতাস করতে শুরু করেছে।

বাতাসটাতে বড়ই আরাম বোধ করলেন শাহ্‌জাদা। এইবার তিনি প্রথম লক্ষ্য করলেন যে, প্রচুর ঘামছেন তিনি। যতক্ষণ বাইরে ছিলেন, গরমে ঝল্‌সে গেছেন কিন্তু ঘাম হয় নি। এ ঘরের দরজা-জানলায় ভিজে খস্‌খসের পর্দা থাকায় বাইরের থেকে যথেষ্ট ঠাণ্ডা, তবু এখানে আসার পর থেকেই ঘামতে শুরু করেছেন। সেই জন্যেই হাওয়াটা এত মধুর লেগেছে তাঁর।

সচেতন হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই মাথার উষ্ণীষটা খুলে চৌকীর

ওপর রাখলেন, তারপর রুমালে মাথা গলা কপাল ভাল ক'রে মুছে নিয়ে—যেন অনেকটা প্রকৃতিস্থ হয়ে, ঈষৎ স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে দেলওয়ারের দিকে চাইলেন। দেখলেন বারতিনেক এই পথ ছুটোছুটি ক'রে রোদে গরমে বেচারীর মুখ শুকিয়ে উঠেছে, বরং বলা উচিত—আউতে গেছে। তার ওপর এই পরিশ্রমে এখন তারও টুপির নিচে দিয়ে কপাল বেয়ে অজস্র ধারায় বড় বড় ফোঁটা ঘাম ঝরে পড়ছে।

প্রসন্ন হলেন শাহ্‌জাদা। সহ্যশক্তি ও কর্তব্যে—নিষ্ঠা শুধু নয় অনুরাগও—এ দুটি গুণই পুরুষের পক্ষে অত্যাবশ্যক। এর দুটোই আছে। ভবিষ্যতে উন্নতি করবে। তিনি একপা এগিয়ে এসে, তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ কোমল কণ্ঠে বললেন, 'থাক, পাখা রেখে দে। আর হাওয়া লাগবে না। টুপিটা খোল, দরকার হয় তো আঙরাখাটাও খুলতে পারিস, তাতে কোন দোষ হবে না।'

পাখাটা রাখল দেলওয়ার কিন্তু নিজের টুপি বা জামা খোলার কোন চেষ্টা করল না। তার বদলে, পালঙ্কের সামনে রাখা ভেলভেটের চটি জুতোটা এনে ওঁর পায়ের কাছে উবু হয়ে বসে আস্তে আস্তে বলল, 'জুতোটা খুলবেন না, জনাব-ই-আলী? এ জুতো যা তেতে উঠেছে, হয়ত ফোস্কা পড়বে।'

একটু হাসলেন শাহ্‌জাদা, তবে বেশ নরম গলাতেই বললেন, 'এত সহজে আমার পায়ে ফোস্কা পড়ে না রে। সে পড়ত বড়ে শাহ্‌জাদা এমনি এলে—তাঁর পায়ে। আমাকে মরুভূমিতে লড়াই করতে যেতে হয়েছে, সেখানে তাত এর চেয়ে ঢের বেশী। এত সহজে ফোস্কা পড়লে কি চলে আমাদের?'

বললেন কিন্তু পা বাড়িয়েও দিলেন। দেলওয়ারের বোধ হয় মনে হয়েছিল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ের জুতো খুলতে গেলে শাহ্‌জাদাকে কিছু ধরতে হবে, আর তখন হয়ত—ওর মনে দুরাশা ছিল—তিনি ওর মাথাটাই ধরতে চাইবেন হাতের কাছে অন্য কিছু না পেয়ে। তাই সে প্রাণপণে গলা উঁচু ক'রে মাথাটা ওঁর হাতের

নাগালের মধ্যে নিয়ে এল কিন্তু শাহ্জাদা সেদিক দিয়েও গেলেন না, আশ্চর্য কৌশলে এক পায়ের ওপরই খাড়া দাঁড়িয়ে আর একটা পা বাড়িয়ে দিলেন।

জুতো পাল্টানো হ'লে ধীরে ধীরে গিয়ে ফরাসে বসলেন। তাকিয়াতেও হেলান দিলেন, কিন্তু শুলেন না। আরাম কবার প্রবৃত্তি বা প্রয়োজন কোনটাই নেই তাঁর। তিনি শুধু এলোমেলো চিন্তাগুলোকে একটু গুছিয়ে নিতে চান মনেব মধ্যে।

এইমাত্র যে কাজটা ক'রে এলেন তিনি—সেটা কি যথার্থই একটা বেহুদা বে-অকুফি হয়ে গেল ?

উন্মাদেব মতো নিজের জাহান্নমের পথ নিজে তৈরী ক'রে দিয়ে এলেন। একেবারে অকারণে চরম সর্বনাশ ডেকে আনলেন ?

তাই যদি হয় তো, সে বে-অকুফি নিজেই ক্ষমা করতে পারবেন না কোন দিন। বুঝবেন যে তিনি কেবল ভাবীকালে বিপুল এই মুলুকের দেশশাসক রূপ গুরুদায়িত্বের অযোগ্য যে—তাই নন, পিতৃ-পিতামহের পরিচয় দেওয়ারও অযোগ্য। অপদার্থ তিনি, ঐ সুরত-হারাম বড়ে শাহ্জাদাব চেয়েও অপদার্থ।

ভাবতে ভাবতে অকস্মাৎ যেন অস্থির হয়ে উঠলেন শাহ্জাদা আওরঙ্গজেব। দেলওয়ার ইতিমধ্যে কখন পাশে এসে দাঁড়িয়ে বাতাস করতে শুরু করেছে—কিন্তু তাতেও যেন শরীর ঠাণ্ডা হচ্ছে না। তিনি আরও জোরে বাতাস করতে ইঙ্গিত করলেন। ঐটুকু বালকের ওপর এটা হয়ত অত্যাচারই হচ্ছে, অন্য সময় হ'লে সেটা মনেও পড়ত শাহ্জাদার কিন্তু মনে পড়ল না। এ সময় অন্য সেবক কাউকে ডেকে বাতাস করতে বলার কথাও ভাবতে পারলেন না তিনি। একা থাকতে হবে এখন তাঁকে। কিছুক্ষণ অন্তত একা থাকা চাই। একমাত্র দেলওয়ারই নিজের অস্তিত্ব বিলোপ ক'রে থাকতে পারে পাশে, সে যে আছে সেটা মনে না রাখলেও চলে।

কী করলেন সেটা একটু তলিয়ে ভাবা দরকার—কিন্তু এখন

ভাবার চাইতে কাজটা করার আগেই ভাবা উচিত ছিল। আসলে সে সময়টাই পান নি তিনি।

আজকের এ ঘটনাটার সূত্রপাত হয়েছে প্রত্যুষেই।

ভোরেই ওঠেন শাহ্‌জাদা। এ তার দীর্ঘকালের অভ্যাস। মদ্য পান করেন না, সুতরাং নেশা কাটাবার জন্য বেলা অবধি ঘুমোতে হয় না। যত রাত্রেই শুতে যান না কেন, শেষ রাত্রে ঠিক উঠে পড়েন—ভোরের আলো পূর্বাকাশ স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে। একাই উঠে প্রাতঃকৃত্য সারেন। ফজরের নমাজ করার আগে, আল্লা তা'লাকে প্রণাম জানানোর আগে কোন ভৃত্যের সাহায্য নেন না তিনি। জগদীশ্বরের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হয় দীনহীনের মতো—তা তিনি জানেন।

আজও ভোরেই উঠেছিলেন। বরং ভোর হওয়ারও আগে। ফজরের প্রার্থনা শেষ ক'রে বাইরের দিকে যখন তাকিয়েছিলেন তখন পূর্ব দিগন্তে লালিমার আভাস মাত্র দেখা দিয়েছে। সাধারণতঃ এসময় কোন ভৃত্য তাঁর সামনে আসে না। তিনি একাই এসে মুন্সীখানায় কাজে বসেন। এখানের কাজ সেরে দফ্‌তরখানায় যান। এখানের কাজ একা-একা করার, ব্যক্তিগত ও গোপনীয়। তিনি চান না এখানে কৌতূহলী বাজে লোকের দৃষ্টি সন্ধানী হয়ে ওঠে।

আর দরকারও হয় না। ধূমপান করার অভ্যাস নেই, ভোরে কিছু খাওয়ারও দরকার হয় না। তাই ভৃত্যদেরও প্রয়োজন হয় না সামনে আসার, তবে কাছাকাছি থাকে তারা। সামান্য আহ্বানেই এসে দাঁড়ায়। শাহ্‌জাদাও তার বেশি চান না। কিন্তু আজ অত ভোরেই, মুন্সীখানায় প্রবেশ করার আগেই তাঁর খাবাস কুণ্ঠিতভাবে এসে অভিবাদন ক'রে দাঁড়িয়েছিল। বিস্মিত বোধ করেছিলেন শাহ্‌জাদা, মুখ তুলে ঈষৎ ভ্রূকুটি ক'রেই প্রশ্ন করেছিলেন, 'কী চাই, কোন জরুরী খবর আছে?'

'জী, জনাব।' সে আর একবার আভূমিনত হয়ে অভিবাদন

করেছিল, 'কাল রাত্রে ফটকে যে দুজন সান্ত্রী পাহারায় ছিল তারা একবার আপনার দর্শন চায়।'

'সান্ত্রীরা আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়? তার মানে? তাদের গুস্তাকী তো কম নয়। যদি তাদের কোন নালিশ থাকে তো মির-ই-বকাউলকে জানাতে বলো। তাদের এমন কি জরুরী কথা থাকতে পারে যা তাদের ওপরওলাকে না জানিয়ে আমাকেই বলতে হবে?'

স্পষ্টই বিরক্ত হয়ে ওঠেন শাহ্‌জাদা।

'সেইটেই তো কিছু বুঝতে পারছি না জনাব-ই-আলী। তারা বলছে যে তাদের যা বলবার তা আপনাকেই তারা বলবে, সেই রকমই নাকি হুকুম আছে তাদের ওপর।'

'হুকুম আছে! তাজ্জব। আমার নৌকরদের আমি ছাড়াও হুকুম দেবার অন্য মালিক থাকতে পারে—তা জানা ছিল না তো! দিতে পারেন এক আলমপনা, আলাহজরৎ, তা তিনি নিশ্চয়ই অত রাত্রে লোক পাঠান নি, তাহ'লে তো তখনই আমাকে ডেকে তুলত।'

'সে কথা আমিও বলেছি আলিজা। কিন্তু তারা জিদ্‌ করছে—বলছে যে, হুকুম দিতে পারেন এমন একজনই এসেছিলেন, আর সে খবর ভোরেই আলিজার কাছে পৌঁছে দিতে হবে বলে গেছেন। যদি তারা কোন বাজে কথা বলে আপনার সময় নষ্ট ক'রে কিম্বা মিথ্যে ক'রে দিল্লগী ক'রে কিছু বলে—তাহলে তাদের জিভ কেটে তাদের সামনেই কুকুরকে দিয়ে খাওয়ানো হবে—একথা তাদের জানিয়েছি, তৎসত্ত্বেও তারা আপনার কাছে আসতে চায়। বলছে যে খুব জরুরী কথা, এখনই জনাব-ই-আলীর জানা দরকার। না হ'লে এর পর আপনিই নাকি রাগ করবেন ওদের ওপর।'

চকিতের জন্য আরও একটু ঘনসম্বদ্ধ হল কি ভ্রূকুটিটা, ঈষৎ একটু কঠিন হয়ে উঠল দৃষ্টি?·· হ'লেও তা এক লহমার জন্যই। বিরক্তি বা বিস্ময় এই সব ইতর লোকদের কাছে প্রকাশ করতে নেই।

যেটুকু করেছেন, তাঁর পক্ষে তা-ই যথেষ্ট। তিনি প্রশান্ত কণ্ঠে শুধু বললেন, 'বেশ, তাহ'লে তাদেব মুন্সীখানাতেই নিয়ে এসো, আমি সেখানেই বসব এখন।'

এখানেই এসেছিল তারা, এই কামরাতেই।

ঠক ঠক ক'রে কাঁপছিল, ভয়ে কি উত্তেজনায়—তা বলা কঠিন। সম্ভবত ভয়েই। তারা জানে যে এর চেয়ে বাঘের গুহায় গিয়ে দাঁড়ানো ঢের সহজ। বড় বড় ঘামের ফোঁটা গড়িয়ে পড়েছিল কপাল দিয়ে সেই অত ভোরেই, কথাও বলতে পারছিল না ভাল ক'রে।

কোনমতে কুর্নিশ করতে করতে সামনে এসে ঐ পদার্থটা রেখেছিল, এখন যেটা যত্ন ক'রে তিনি লেখার চৌকীতে, কলমদানের পাশে রেখে দিয়েছেন।

'কী এটা? এ জিনিস এখানে কেন?' জলদগম্ভীরস্বরে প্রশ্ন করেছিলেন শাহ্‌জাদা, 'এসব কি দিল্লগী শুরু হ'ল ভোর বেলাতেই? রাতের নেশা ছোটে নি বুঝি এখনও, শিরটা কাঁধ থেকে না নামলে ছুটবে না?'

'মাফ—মাফ করবেন জনাবেহকীম।' গলা কাঁপছিল তাদের, 'কোন নেশা করি নি, খোদা সাক্ষী। যদি নেশা ক'রে থাকি তো এখনই যেন মাথায় বজ্রাঘাত হয়।···· আপনার সঙ্গে দিল্লগী করব এত হিমাকতও আমাদের হবে না, আমাদের ঘাড়ে দুদশটা শিব নেই।······আ-আমাদের কোন দোষ নেই আলিজা, কাল শেষ রাত্রে সেই আওরৎ এসে এটা দিয়ে গেছে, বলে গেছে আজ ফজরেই যেন এটা আপনার সামনে এনে হাজির করি—না হ'লে আমাদের নাকি শির থাকবে না, আমাদের নাতোয়ানির জন্যে জনাবালির কাছে জবাবদিহি করতে হবে।'

'আওরৎ! আওরৎ দিয়ে গেছে! কে সে আওরৎ? কার এত বড় স্পর্ধা যে আমার সঙ্গে এমন ভাবে দিল্লগী করে।'

'কে তা বলতে পারব না বন্দানওয়াজ। বুরখা পরা ছিল। শুধু

তার হাতটা দেখেছি। খুবসুরৎ হাত—কোন বড় ঘরের লেড়কী কি ঘরোয়ালী হবে নিশ্চয়।'

এবার আর শাহ্‌জাদার উষ্মা চাপা রইল না। ক্রোধে অঙ্গারবর্ণ ধারণ করল তাঁর স্বভাব-আবক্ত সুগৌর মুখ। আর ওদের দিকে তাকালেনই না তিনি, খাবাসকে উদ্দেশ ক'রে ভীষণকণ্ঠে বললেন, 'খোজা আব্বাস কোথায়? তাকে ডেকে পাঠাও। এই সব সান্ত্রীদের কে চাকরী দিয়েছে আমি জানতে চাই। বেছে বেছে এই সব পাঁড় বে-অকুফ্‌কে ধবে এনেছে কেন আর কোথা থেকে—জানা দরকার। কত ঘুষ খাচ্ছে সে? এমনভাবে আমার টাকা নষ্ট করানো যায় না—সেটা তাকে ভাল ক'রে জানিয়ে দেওয়া দরকার, যাতে জীবনে আর না ভোলে।'

সান্ত্রী দুজনের ততক্ষণে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, পা দুটো এতই কাঁপছে যে আর দাঁড়ানো সম্ভব নয়। তারা বলতে গেলে ওঁর এই পালঙ্কের নিচে ওঁর পায়ের সামনে আছড়ে পড়ল।

'হজরৎকুম আপনি আমাদের মা-বাপ, আপনার কুত্তার কুত্তা আমরা, আপনার গুস্‌সার যোগ্য নই। আমাদের জান নেওয়া আপনার এক লহমার কাজ, আর যদি আপনার খুশি হয়—এখনই দিতে তৈয়ার আছি। শুধু বান্দাদের আর্জিটা একবার শুনতে হুকুম হয় জনাব-ই-মবারক। সত্যিই বলছি, আমাদের কোন দোষ নেই। খোদা জামিন, নেশাও করি নি আমরা। আপনার নৌকরদের মধ্যে এমন সাহস কারও নেই যে সরাপ খাবে কি অন্য নেশা করবে। আর এত বে-অকুফও নই যে পথের এক বেগানা আওরতের কথায় এক খিলৌনা নিয়ে ভোরবেলাই আপনাকে দিক করতে আসব। আমরা সে আওরৎকে তো হাঁকিয়েই দিয়েছিলুম কিন্তু শেষ পর্যন্ত আপনার মোহরী আংটি দেখাতেই আর কিছু বলতে পারলুম না।'

'কী? কী দেখাল?' উত্তেজনায় শাহ্‌জাদা উঠে দাঁড়ালেন একেবারে।

'আ-আপনার মোহরতের আংটি* জনাবালি, মুহর-ই-সুলেমান।'

'আমার মোহরতের আংটি! সে তো এই আমার হাতে রয়েছে —গদ্‌ধে কে বচ্চে, বে-অকুফ।'

তিনি তাঁর বাঁ হাতের অনামিকা প্রসারিত ক'রে ধরলেন।

মাথা আর তুলতে পারছে না ওরা কিছুতেই। তবু, বোধ করি মৃত্যুকে অবধারিত আর সামনে প্রত্যক্ষ ক'রেই মরীয়ার সাহস সঞ্চয় ক'রে। বলে, 'সে তো দেখছি হুজুর কিন্তু অবিকল এই আংটি দেখেছি তার হাতেও। খুব ভাল ক'রে দেখেছি লণ্ঠনের আলো ধরে। যদি ঝুট বলে থাকি তো যেন জাহান্নমেও ঠাঁই না হয় আমাদের। তা ছাড়া আমরা জানি আলিজা, যে আপনার সামনে ঝুট বললে স্বয়ং বড়ে পীরসাহেবও আমাদের বাঁচাতে পারবেন না। এ জান চোখের পলক ফেলার আগেই চলে যাবে তা জেনেই বলছি গরীব পরোবর, খোদা জামিন।'

অস্পষ্ট ঝাপ্‌সা একটা কী স্মৃতি যেন বিস্মৃতির জলে সাঁতার দিয়ে এদিকে আসছে। বহুদিন, বহুকালের ব্যবধান—দূর শ্বেতবিন্দুর মতোই অস্পষ্ট, তবু তার অস্তিত্ব একটা টের পাচ্ছেন ঠিকই।

কিন্তু সে তাঁর মনেই তখনও কোন আকার নেয় নি। তাই কঠিনতর কণ্ঠে আবারও প্রশ্ন করেন, 'আমার মোহর করার আংটি তোমরা চিনলে কি ক'রে।'

দেখা গেল এ প্রশ্নের জন্য তারা প্রস্তুতই ছিল, তেমনি ঘাড় গুঁজেই জবাব দিল, 'বহু খতে আর হুকুমনামায় জনাবালির মোহর দেখেছি আমরা। অনেক খৎ আমাদেরই নিয়ে যেতে হয়েছে অনেক সময়।'

'সেই আংটি এক আওরৎ দেখিয়ে গেল। আওরৎ!'

তখনও অবিশ্বাসের সুরে প্রশ্ন করেন শাহ্‌জাদা।

* Signet Ring—গালার ওপর বা মোমের ওপর মোহর করার জন্য

'কী রকম আওরৎ সে ? একা এসেছিল, না সঙ্গে কেউ ছিল ? ডুলিতে এসেছিল, না পায়ে হেঁটে ? গাড়িতে এলে আমি আওয়াজ পেতুম।'

'সঙ্গে ছিল একজন কিন্তু তাকে কোন বাঁদী কি পাহারাদারনী বলে মনে হ'ল। যিনি এ খিলৌনা দিলেন তাঁর মুখে রেশমী বুরখা চাপা ছিল, মুখ দেখি নি, গলার আওয়াজে মনে হ'ল নওজোয়ান লেড়কী কেউ হবে। বড় ঘরের মেয়ে তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

বিন্দুটা আব একটু কাছে এসেছে। তবু চিনতে পারছেন না।

এখন মনে হচ্ছে এই মোহরের আংটি একসঙ্গে দুটো করিয়েছিলেন যেন। একটা যেন কাকে দিয়েছিলেন—

কাকে দিলেন যেন। কী একটা ক্ষণিকের দুর্বুদ্ধিতে—

এইটুকু মনে পড়লেই দীর্ঘকালের কালো পর্দাটা সরে যায়—অতল আধার ব্যবধান যায় কমে।

অপেক্ষাকৃত বয়স্ক সান্ত্রী ইয়ার আলিই কথা বলছিল এতক্ষণ, শাহ্‌জাদা ভ্রূকুটিবদ্ধ দৃষ্টিতে নীরবে তার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। দৃষ্টি বলা ভুল, চোখেব তারাই ছিল ওর মুখের ওপর স্থির হয়ে—দৃষ্টি তখন কালো পর্দার আবরণ ভেদ করতে ব্যস্ত।

অনেকক্ষণ, এদের মনে হ'ল এক যুগ পরে বললেন, 'কী বলেছে সে আওরৎ ? কী বলেছে ঠিক ঠিক ইয়াদ আছে ?'

'ঠিক ইয়াদ আছে হুজুর। ঐ বাঁদীটা জিদ্দি করছিল তখনই আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে, কিম্বা সেই অত রাত্রেই ঘুম ভাঙিয়ে এটা পৌঁছে দিতে—আমরা রাজী হই নি, বলেছিলুম যে আমাদের গর্দানের ওপর একটাই শির আছে, ও আমরা পারব না। ঠিক ঠিক নিশানী দিলেও না হয় আমাদের ওপরওলা খাজা আব্বাসকে জানাতে পারি। তখন ঐ নওজোয়ান বুরখাউলীই বলল যে তাতে দরকার নেই, কিন্তু এই জিনিসটা যেন অতি অবশ্য ভোরবেলা ফজরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে আলিজাকে পৌঁছে দিই আমরা।…বলে

গেল খুব দরকারী জিনিস, খোদ আপনার সামনেই হাজির করা চাই। বলল, খুব জরুরী এ কাজ, দেরি হলে জনাবালির কাছে নাকি জবাবদিহি করতে হবে আমাদের। নৌকরি তো যাবেই, জান যাওয়াও বিচিত্র নয় নাকি। আর বলল যে, এটা দিলেই আপনি বুঝতে পারবেন, কিছু বলতে হবে না।'

'তা খামকা তোমাদের মোহরের আংটি দেখাতে গেল কেন?'

'আমরা প্রথমে এ ভার নিতে চাই নি খুদাওয়ান্দ্। আগে ভেবেছিলুম মস্করা করছে আমাদের সঙ্গে। কিম্বা আসলে ওদের কোন বদ-মতলব আছে, হয়তো দারু খেয়ে নেশার ঝোঁকে আপনার সঙ্গে দিল্লগী করতে এসেছে। আমাদের জান দিয়ে এই দিল্লগীর খেশারৎ দিতে হবে—তাতেই ওদের ফুর্তি।······তাই, যখন একেবারে বেঁকে দাঁড়ালুম, তখনই ঐ আংটিটা দেখাল। বলল, ইচ্ছে করলে তারা এখনই ভেতরে ঢুকতে পারে। তবে তার দরকার নেই। এই জিনিসটা পৌঁছে দিলেই হবে। আংটির কথা বললেই খুদাওয়ান্দ্ চিনতে পারবেন তাদের, এ জিনিসটা দিয়ে যাওয়ার অর্থও বুঝতে পারবেন।'

মনে পড়েছে, এতক্ষণে মনে পড়েছে তাঁর।

আংটি তিনি দুটোই করিয়েছিলেন এক সঙ্গে। আগে যেটা তাঁর হাতে থাকত সেটা তিনিই স্বেচ্ছায় খুলে দিয়েছিলেন একজনকে।

যাকে দিয়েছিলেন, সে-ই এসেছিল কাল রাতে তাতে কোন সন্দেহ নেই আর।

কিন্তু এতকাল পরে, এত রাত্রে সে কী বার্তা জানাতে এল এমনভাবে, জান হাতে নিয়ে?

এ আসার বিপদ শাহ্জাদা জানেন। সে যেখানে আছে, সেখান থেকে এভাবে রাত্রে বেরিয়ে আসা—। উঁহু ভাল করে নি, মোটেই ভাল করে নি।···

আর কেনই বা এ ঝুঁকি নিতে গেল ?

এই আঁধেরা রাতে কোন্ প্রাণের দায়ে এমনভাবে এল সে ?

কেন ? কেন ?……

এই আংটিটা যখন চেয়ে নেয় তখন অবশ্য এই কথাই বলেছিল যে, 'কোথায় থাকব কোথায় গিয়ে পড়ব তা তো জানি না। তবে যদি কোনদিন কাছাকাছি এসে পড়ি আর আপনাকে খুব দেখতে ইচ্ছা হয় একবার—তাহ'লে যাতে বিনা তকলিফে আপনার কাছে পৌঁছতে পারি, এমন কোন নিশানী একটা দিন আমাকে। এমন কোন জিনিস যা আপনি ব্যবহার করেছেন, যা দেখলে আপনার কথা আমার মনে পড়বে, যা দেখে ভবিষ্যতে আপনারও মনে পড়বে আমার কথা।'

এখনও কি সে সত্যিই মনে ক'রে রেখেছে তাঁর কথা ?

এতকাল পরেও ?

আশ্চর্য! শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজেবের এইটেই বড় অহঙ্কার যে তিনি কাউকে ভোলেন না, কিছুই ভোলেন না। তকব্বরি মানেই গুণাহ্—তাই খোদা সেটা চূর্ণ ক'রে বুঝিয়ে দিলেন। তিনি তো ওর কথা ভুলেই বসেছিলেন এতকাল। তা নইলে এতক্ষণ সময় লাগত না মনে করতে।

না, ভোলা সত্যিই উচিত হয় নি তাকে, সেই একরাত্রের ছোট্ট পিয়ারাটিকে। সেদিন অনেক জুলুম করেছিলেন তার ওপর, অনেক অন্যায় করেছিলেন কিন্তু তার বদলে সে দিয়েছিল তাঁকে অন্তরের প্রীতি আর শ্রদ্ধাই। তাঁর কাছেই থাকতে চেয়েছিল সে, তাঁরই সেবার অধিকার চেয়েছিল। তা তিনি দেন নি, হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। তবু সে রাগ ক'রে নি, ঘৃণা ক'রে নি তাঁকে।

তা যে করে নি—সেদিন তার চোখ দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন তীক্ষ্ণধী শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজেব।

কিন্তু এটার অর্থ কি ? এই পদার্থটা পাঠাবার ?…

জিনিসটা হাতে ক'রে তুলে দেখেছিলেন সকালের আলোয়। আগে ভেবেছিলেন ওর মধ্যেই এমন কোন সঙ্কেত আছে কিম্বা কোন চোরা খাঁজে এমন কোন খৎ—যা দেখেই বুঝতে পারবেন তিনি। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে তন্ন তন্ন ক'রে দেখেও তেমন কিছু খুঁজে পেলেন না। কোথাও কোন লিপি কি চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

আর থাকবেই বা কোথায়? সামান্য জিনিস একটা। এ জিনিসের কথা কোন শাহ্‌জাদা বা কোন নবাব আমীরের জানার কথা নয়। অপর কোন শাহ্‌জাদা চিনতেই পারতেন না। আওরঙ্গজেব সব প্রয়োজনীয় জিনিসের খবর রাখেন বলেই বুঝতে পারলেন এটা কী। ফৌজের সঙ্গে যখন রসদ যায়—তখন তিনিই একমাত্র সিপাহ্‌সালার যিনি মনে ক'রে এই জিনিস কতকগুলো কিনে নিয়ে যান।

চুহাকল একটা। ইঁদুর ধরার খাঁচা।

তবে ঠিক বাজারের চুহাকল নয়। মনে হয় ফরমাশ দিয়ে তৈরী করানো এটা। কাঠের নয়, লোহার তৈরী। তাও তার দিয়ে নয়—বাক্সর মতো লোহার পাত দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। বিশেষ ক'রে দরজাটা—যেমন ভারী তেমনি মজবুত। এমনভাবেই তৈরী যে ইঁদুর দরজার মধ্যে পা দেওয়া মাত্র এটা পড়ে যাবে আর তার পর ইঁদুর যত বলিষ্ঠ এবং বৃহদাকারই হোক তার সাধ্য থাকবে না এ কপাট ঠেলে খোলার! শুধু তাই নয়—বাইরের এক বিন্দু হাওয়া ঢোকবারও কোন পথ নেই, নেই ভেতর থেকে কোন শব্দ আসবার সামান্য একটু ফাঁক। যে ইঁদুর এতে পড়বে—দম বন্ধ হয়েই মরে যাবে!

বলতে গেলে সারা সকালটাই কোন কাজকর্ম করতে পারেন নি শাহ্‌জাদা। কেবলই বসে বসে ভেবেছেন আর জিনিসটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছেন। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও কোন মাথা-মুণ্ড খুঁজে পান নি। অথচ তিনি জানেন, যে দিয়ে গেছে সে এতকাল পরে নিছক রসিকতা করতে আসে নি। নিশ্চয়ই এর কোন নিগূঢ় অর্থ

আছে, তিনিই এখনও ধরতে পারছেন না। তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং অন্তর্ভেদী দৃষ্টি বহু দূর পর্যন্ত যায় তা তিনিও জানেন—এটা কোন দুর্বিনয় নয়, নিছকই তথ্য একটা—কিন্তু আজ তাঁর সেই বুদ্ধিও হার মেনেছিল, নেহাৎই বাধ্য হয়ে সরিয়ে রেখেছিলেন ইঁদুর-কলটা।

তারপর আর বেশি সময়ও পান নি ভাববার।

খুব জরুরী চিঠি ছিল খানকতক, যা তাঁর নিজের লেখা দরকার। কতকগুলো দলিল পরোয়ানা সই করার ছিল—আদ্যোপান্ত না পড়ে তুচ্ছ কোন কাগজেও সই করেন না শাহ্‌জাদা—তারপর ছিল দৈনিক হিসাবগুলোয় চোখ বোলানো। মুনীম প্রতিদিনের হিসেব তৈরী ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে, সেগুলো নিজে দেখে দেন। এই প্রাত্যহিক কাজ সারতে সারতেই গোসলের সময় হয়ে গিয়েছিল। প্রথম প্রহর পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, কিল্লার ঘড়িতে ন'টা বাজলেই শাহ্‌জাদাদের নিজের নিজের বজরায় চাপতে হবে, আলমপনার এই খুশমর্জি কাল জানিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁদের।

তবু কথাটা কোন সময়েই একেবারে ভুলে থাকেন নি।

নামাজের সময় অন্য সমস্ত চিন্তা জোর ক'রে ঝেড়ে ফেলে দেন মন থেকে—আজ তাও পারেন নি। স্নানের সময়, নামাজের সময়, নাস্তা করতে করতে মনের অবচেতনে সর্বদাই কথাটা তোলপাড় করেছে মনের মধ্যে। বজরায় উঠে নিরিবিলিতে ভাল ক'রে চিন্তা করবেন ভেবে রেখেছিলেন, তা হয় নি। বাদশা ডেকে নিজের নৌকোয় তুলে নিয়েছেন। সেখানে শুধু কানই নয়—সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ সতর্ক রাখতে হয়েছে। বাদশার যখন খোশগল্পের মর্জি হয় তখন শ্রোতাদের অন্যমনস্ক থাকা বিষম অপরাধ। তা ছাড়াও, অন্য শাহ্‌জাদারা কে কি বলছেন, কার কথার কী গূঢ়ার্থ, সে সম্বন্ধেও সজাগ সতর্ক থাকা প্রয়োজন। কে কোথায় কি খোঁচা দিয়ে গেল, কোথা থেকে কোন খবরের টুক্‌রো গেল পড়ে, কার অসতর্কতার অবসরে—এগুলো জানা প্রয়োজন। অন্তত তাঁর প্রয়োজন। আর

কিছু না হোক তিনি যদি বিন্দুমাত্র অন্যমনস্ক হন বা বাদশার কথার উত্তর দিতে একটুখানিও দেরি হয়—অন্য শাহ্‌জাদারা তৎক্ষণাৎ সেদিকে বাদশার মনোযোগ আকর্ষণ ক'রে চুকলি খাবার সুযোগ নেবেন।

ভাবনাটা ছিলই, কিন্তু সেটা নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করার সুযোগ বা অবসর পান নি। সব সময়েই বাদশার সামনে, ভাইদের সামনে থাকতে হয়েছে। বিশেষতঃ বড়ে শাহজাদার দৃষ্টি ও শ্রুতি যে সম্পূর্ণ তাঁর দিকেই নিবদ্ধ তা তিনি জানেন। কাফেরদের পুরাণে নাকি আছে খোদাতায়ালাকে যে বৈরীভাবে ভজনা করে সে নাকি ভক্তদের থেকে আগে তাঁর করুণা লাভ করে। বড়ে শাহ্‌জাদাও যেন তাঁকে সেই রকম বৈরীভাবে ভজনা করেন। অনুক্ষণের ধ্যান-জ্ঞান তাঁর এই তৃতীয় সহোদরটি।···

না, কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারেন নি তিনি, ওবাড়িতে যাবার পরেও বহুক্ষণ পর্যন্ত।

একেবারে বিদ্যুৎ চমকের মতো কথাটা তাঁর মাথাতে গেছে, বড়ে শাহ্‌জাদা তহ্‌খানায় বিশ্রাম করতে যাওয়ার প্রস্তাব করতে। নতুন ধরনের তহ্‌খানা বানিয়েছেন তিনি, ওঁরা শান্তিতে নির্জনে বিশ্রাম করবেন বলে।···মেঘ ঘন অন্ধকার আকাশে যেমন এক এক সময় এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত বিদ্যুৎ খেলে গিয়ে সমস্ত নিচের দুনিয়াটা অকস্মাৎ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে, তেমনি এতক্ষণের আকুল সংশয়ান্ধ-কারও তাঁর সেই একটি বিজলী-বিকাশে মুহূর্তের জন্য কেটে গেল, বড়ে শাহ্‌জাদার মনের প্রত্যন্ত প্রদেশ পর্যন্ত দেখতে পেলেন তিনি। সেই সঙ্গে খুঁজে পেলেন প্রভাতে ঐ চুহাকল উপঢৌকনের অর্থ!

তখন আর মুহূর্তকালও অবসর ছিল না দ্বিধা বা ইতস্তত করার। সঙ্গে সঙ্গেই ইঙ্গিত করেছেন দেলওয়ারকে প্রাসাদে ফেরার জন্যে। এ ইঙ্গিতও করেছেন যে এখানে তাঁর কোন বিপদ ঘটাও বিচিত্র

নয়। বেশি সময় লাগে নি অবশ্য ব্যাপারটা ওকে বুঝিয়ে দিতে, চোখের পাতা নড়া দেখে বুঝতে পারে ছেলেটা—তাঁর অভিপ্রায় বা আদেশ।

তবু তখনও যেটুকু সংশয় ছিল, ঐ লোহার ভারী দরজাটা দেখে সেটুকুও আর রইল না, যে দরজার কোন চিহ্ন বাইরে থেকে নজরে পড়ে না, যা খোলা বা বন্ধ হওয়ার সময় বিন্দুমাত্র শব্দ করে না, যার ভেতর থেকে এক বিন্দু বাতাস বা প্রাণপণ চিৎকারও বাইরে আসতে পারে না।

ইচ্ছে ক'রেই সকলের পিছনে ছিলেন তিনি। মিলিয়ে নেবার, সংশয়ের কতটা যথার্থ—যাচই করবার জন্যে। কিন্তু দরজাটা দেখার পর আর চিন্তা করার অবসর মেলে নি, বিচার-বিশ্লেষণেরও না। কতটা ঝুঁকি নিচ্ছেন—তার ফলাফল ওজন ক'রে দেখার মতো সময় ছিল না আর। পাকা জুয়াড়ির মতো তাই চোখ বুজেই বাজী ধরেছেন। এসপার কি ওসপার। সর্বনাশের খেলা তাঁর—কিম্বা সর্বরক্ষার।

কী করলেন, কী ক'রে এলেন—বেতরবিয়ৎ বে-অকুফের মতো নিজের তকদির নিজেই নষ্ট ক'রে এলেন কিনা—সেইটেই এখনও বুঝতে পারছেন না। সত্যিই কি বড়ে শাহ্‌জাদা এতবড় শয়তানি এঁটেছিলেন মনে মনে, নাকি তিনিই নিজের অন্তরের বিষে এতটা বে-ইনসাফি, এতটা অবিচার ক'রে বসলেন।

কে বলবে তাঁকে, কেমন ক'রে নিঃসংশয় হবেন তিনি?

অপারগ নাতোয়ান তিনি নন, সর্বস্ব গেলেও যদি ভগবানের দয়া হয়—বুদ্ধি এবং শক্তি যদি থাকে, তো একদিন আবার সব-কিছুই বাহুবলে অর্জন করতে পারবেন—তাও জানেন, কিন্তু সে এখন বিপুল সময়সাপেক্ষ। সাতসমুদ্রের জল খেতে হবে তাঁকে জীবনের নৌকো সাফল্যের ঘাটে ভেড়াবার আগে।

ঈশ্বরে যতই বিশ্বাস থাক, ইনশা আল্লাহ্‌ বা ঈশ্বরের মর্জি বলে মনে ক'রেও নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না তাই। অনেক বড বাজী

ধরেছেন তিনি, নিজের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ভবিষ্যৎ—এক কথায় এই জিন্দিগীটাই।

নিজে নিশ্চিত হ'তে পারলে, আর যাই হোক অনেকখানি সান্ত্বনা লাভ করতে পারতেন তিনি। সেইটেই যে এখনও হ'তে পারছেন না।

॥ ৪ ॥

আবারও যেন কেমন হাঁফ ধরার মতো মনে হ'ল তাঁর। আরও একবার ছটফট ক'রে উঠলেন। কিন্তু এবার—আরও জোরে বাতাস করার কথা বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। ছেলেটার দিকে চেয়ে নিজের এই সামান্য অসুবিধার কথা বলতে পারলেন না। দেখলেন শক্তি ও সামর্থ্যের প্রায় শেষ সীমায় এসে পড়েছে সে। সমস্ত মুখ ঘামে ভিজে যেন চুপ্‌সে গেছে, কাগজের মতো সাদা দেখাচ্ছে। বাতাস এখনও করে যাচ্ছে কিন্তু হাত তুটো থর থর ক'রে কাঁপছে তার, বোধ হয় পাখাটা এখনই পড়ে যাবে, সেই সঙ্গে সেও।

নিমেষে অনুতপ্ত হয়ে উঠলেন শাহ্‌জাদা।

ইস্, বড়ই অন্যায় হয়ে গেছে। আরও ঢের আগে খেয়াল করা উচিত ছিল।···তিনি এক ঝট্‌কায় দেলওয়ারের হাত থেকে পাখাটা নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, তারপর তার হাত ধরে টেনে কাছে নিয়ে এলেন। ফরাসের ওপর, একেবারে কাছেই আনতে চান তিনি। কিন্তু দেলওয়ার যেন এতখানি ধৃষ্টতার আভাসেই শিউরে উঠল। কথা কওয়ার শক্তি ছিল না নইলে বলে উঠত হয়ত, 'না না জনাব-ই-আলী, ওতে আমার গুণাহ্‌ হবে।'

আওরঙ্গজেব ওর মনের ভাব বুঝলেন। সস্নেহ কণ্ঠে বললেন, 'এইখানে বসে আমার পা তুটো টিপে দে বে-অকুফ, আমি কি তোকে আরাম করার জন্যে ওপরে বসতে বলছি!'

পা টিপে দেবার জন্যে ফরাসের ওপর মনিবের সঙ্গে এক আসনে কেন বসতে হবে সেটা তখনও মাথাতে গেল না দেলওয়ারের, এই তো নিচে হাঁটু গেড়ে বসে এখান থেকেই বেশ দেওয়া যায়। এবারেও সামান্য একটুখানি ইতস্তত করাতেই বুঝতে পারলেন শাহ্জাদা—একেবারে ওর কান ধরে একটু ধমকের সুরেই বললেন, 'আমি হুকুম দিয়েছি না ? হুকুম যা-ই হোক, তৎক্ষণাৎ তা তামিল না করার মানেই বে-আদবি, গুস্তাকী। একদিন তো পরিষ্কার বলে দিয়েছি কথাটা—বার বার একই কথা বলা আমার পছন্দ নয়।'

অগত্যা অতি সন্তর্পণে সেই ফরাসের ওপরই বসল দেলওয়ার। পা টিপে দেওয়ার কথাটাই সত্যি বলে ভেবেছে সে, তাই তাড়াতাড়ি ওঁর পা দুটো নিজের কোলে তুলে নিতে যাচ্ছিল, শাহ্জাদা তাঁর বলিষ্ঠ হাতের আকর্ষণে একেবারে কোলের কাছে টেনে নিলেন, আর এক হাতে ওর সেই আউতে-পড়া কচি মুখখানা নিজের দিকে ফিরিয়ে ধরে প্রশ্ন করলেন, 'তুই আমাকে খুব ভালবাসিস, না রে ?'

লজ্জায় সুখে, অকল্পিত সৌভাগ্যে ওর স্বেদধৌত বিবর্ণ মুখে যেন এক মুঠো আবীর মাখিয়ে দিল কে। চোখ নত করতে পারল না বলেই বুজে এল, কোনমতে ঘাড় নেড়ে জানাল, হ্যাঁ, সে ওঁকে ভালবাসে।

'খুব—? খুব ভালবাসিস ? ভালবাসিস না ভয় করিস—ঠিক ক'রে বল্ তো !'

এইবার অতি কষ্টে বলল দেলওয়ার, 'ভয় করব কেন মালিক, ভয় পাওয়ার মতো তো কিছু দেখি নি আপনার মধ্যে। যত মানুষ দেখেছি আপনি সকলের চেয়ে বড়—আমার কাছে আপনার চেয়ে বড় কেউ নেই।'

'আমাকেও ভালবাসে কেউ কেউ! অন্তত দুজন তো বাসে দেখছি।···বিনা স্বার্থে, শুধু আমার জন্যেই আমাকে কেউ ভালবাসতে পারে তা ভাবি নি কখনও। আশ্চর্য !'

অন্যমনস্কভাবে, কতকটা স্বগতোক্তির মতো ক'রেই কথাগুলো

বললেন শাহ্‌জাদা, আর বলতে বলতেই কেমন যেন গলা জড়িয়ে এল শেষের দিকে, স্তব্ধ হয়ে কী এক গভীর চিন্তার মধ্যে ডুবে গেলেন।

হ্যাঁ আরও একজন ভালবাসে তাঁকে—বিনা স্বার্থেই ভালবাসে। সেটা আজ নিঃসংশয়ে জেনেছেন।

তার জানা বা বোঝার ভুল হ'তে পারে—কিন্তু তাঁর জন্যে তার এই আকুলতাটা মিথ্যা নয়।

অথচ তিনি জানেন, আজ সে জন্যে তাঁর লজ্জা ও অনুতাপের শেষ নেই, এতখানি ভালবাসা পাবার মতো কোন যোগ্যতাই তাঁর ছিল না। কতটুকুরই বা পরিচয় তাঁর সঙ্গে, কতটুকুর দেখা। তাও, সেই প্রথম এবং বোধকরি শেষ পরিচয় যা সে তার পেয়েছে, যে ব্যবহার তিনি করেছেন তার সঙ্গে—তাতে ঘৃণা করাই উচিত ছিল তাঁকে। একটা ভয়ঙ্কর দুঃস্মৃতিই জেগে থাকার কথা তাঁর সে আচরণের। তবু সে তাঁকে ভালবেসেছে, এতকাল তাঁর কথা মনে ক'রে রেখেছে, তাঁর স্মারক সযত্নে বহন করেছে এই দীর্ঘদিন—এর চেয়ে বিস্ময়কর আর কী হ'তে পারে!

এখন সবটাই মনে পড়ছে তাঁর—সেদিনের সমস্ত ঘটনাগুলো।

ছবির মতো ফুটে উঠেছে মনে।

বাদাখ্‌শানে যাওয়ার পথে কাশ্মীরের প্রান্তে এসে কয়েকদিন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজেব। বিশ্রাম নেওয়ার কথা নয়, সে ইচ্ছাও ছিল না, বাধ্য হয়েই থামতে হয়েছিল তাঁকে। পিছনের সরবরাহ অনেকখানি পিছিয়ে পড়েছে। সামনের পাহাড়ী পথে এ অবস্থাটা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। যখন তখন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে, পাহাড়ে ধ্বস নেমে রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়া তো এখানে অতি সাধারণ ঘটনা। সে ক্ষেত্রে রসদ যদি সঙ্গে না থাকে তো এতগুলো লোক শুকিয়ে মরবে। যে পথে যেতে হবে

এখন থেকে, সে পথে সামান্য কিছু কিছু ফল আর তুচারটে তুম্বা ছাড়া কিছুই মিলবে না। তার ওপর আছে এখানকার পাঠান উপজাতিদের আকস্মিক আক্রমণের মোকাবিলা করা। ওরা এই রকম সুযোগই খোঁজে, সাময়িক বিপদ কি অপ্রস্তুত অবস্থার অবসরে নেকড়ের পালের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে লুঠপাট ক'রে নিয়ে যায়। সুতরাং রসদ ও গোলাবারুদ সঙ্গে না নিয়ে আর এগনো ঠিক নয়।

এরকম বিলম্ব তাঁর কখনও হয় না। আগ্রার অব্যবস্থাতেই এসব হয়েছে। সরকারী গড়িমসির ফল এটা। কাজের ভার দিয়ে রওনা করেছেন তাঁরা—বড় বড় উপদেশের মালা পরিয়ে—কিন্তু নিজেদের দায়িত্বটুকু পালন করেন নি। কে জানে এই অযথা বিলম্বের মধ্যে তাঁর বড় ভাইয়ের হাত ছিল কিনা। শাহ্‌জাদার বিশ্বাস তা ছিল।

বিরক্ত হয়েছিলেন আওরঙ্গজেব খুবই—তিনি কাজের লোক, নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকা তাঁর পক্ষে শাস্তির মতো কিন্তু কিছু করবারও ছিল না তাঁর, নিরুপায় রোষে নিজেরই অধরোষ্ঠ নিজে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করা ছাড়া। শেষে একরকম মরীয়া হয়েই ঠিক করেছিলেন, কয়েক দিনের জন্যে কাশ্মীর ঘুরে আসবেন। অল্প কয়েকজন দেহরক্ষী নিয়ে চলে গিয়েছিলেন তিনি, এখানকার ছাউনী অক্ষত রেখে, অনেকে টেরও পায় নি, এমন চুপিচুপি চলে গিয়েছিলেন তিনি।

যেতে যেতে পথেই খবর পেয়েছিলেন—ইরাণ থেকে একজন বড় কারবারী একদল ভাল ক্রীতদাসী এনেছে, তারা লাহোর হয়ে আগ্রার বাজারে যাবে। সে নাকি শাহী হারেমেরই উপযুক্ত, সন্ধান পেলে শাহ্‌জাদার দলই চড়া দামে কিনে নিয়ে যাবেন, ওমরাদের কাছ পর্যন্ত পৌঁছবে না। সোজাই চলে যেত, কিন্তু এতটা দূর পথ আসার ফলে গরমে আর পথশ্রমে অনেকেরই শরীর খারাপ হয়ে গেছে বলে এখানে ঠাণ্ডায় বিশ্রাম করিয়ে নিচ্ছে। এদের বেশির ভাগই নাকি এসেছে ঠাণ্ডা মুলুক থেকে—তাই গরমে কারও

কারও ঘামাচি বেরিয়ে চামড়া বিশ্রী হয়ে গেছে, সে জন্যেও কদিন এইরকম জায়গায় থাকা দরকার। দেহটাই যেখানে প্রধান পণ্য, সেখানে সেটা যথেষ্ট লোভনীয় অবস্থায় না থাকলে দাম উঠবে না। এখানে এতদিন রেখে বসিয়ে খাওয়াতে অতিরিক্ত কিছু খরচ হ'লেও সেটা নেহাৎ অকারণ নয়, শরীরটা আবার তাজা হয়ে উঠলে, চামড়ার গুলাবী রং ফিরে এলে—এসব খরচা সুদসুদ্ধ পুষিয়ে যাবে।

স্ত্রীলোক সম্বন্ধে বাবরশাহী বংশের অপর পুরুষদের মতো খুব একটা লোভ নেই শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজেবের, কিন্তু একেবারে কিছু ছিল না বললেও ভুল হবে। সেটা স্বাভাবিকও নয়। তখন একেবারেই কাঁচা বয়স, ঐ বয়সের স্বাস্থ্যবান কর্মঠ তরুণের রক্তে চাঞ্চল্য কিছু তো থাকবেই। তবে প্রথমটা লোভের থেকে কৌতূহলটাই প্রবল হয়েছিল। বিশেষ যখন শুনলেন যে, এসব মেয়ের কেউই সাধারণ বাঁদী নয়, বহু দূর থেকে, ইরাণের উত্তরে ক্রেস্তান মুলুক থেকে সাদা চামড়ার মেয়ে ধরে আনা হয়েছে, অনেক কষ্ট স্বীকার ক'রে, অনেক অর্থ ব্যয় ক'রে—রুশের বাদশার অধীন সে সব দেশ, সেখানের আইনও খুব কড়া, সুতরাং প্রাণ হাতে ক'রেই এ কাজ করতে হয়েছে মহাজনকে—তখন সে কৌতূহল প্রায় অসম্বরণীয় হয়ে উঠেছিল। আর্মাণী বাঁদী দু-চারটে এর আগে দেখেছেন, তাঁর হারেমেও আছে দু একটা—এরা নাকি আরও উত্তরের, এদের গায়ের রং দুধের মতো। সুতরাং দেখার মতো নিশ্চয়ই।

বাঁদী তিনি কিনবেন না—সে সামর্থ্যও নেই, সে অভিরুচিও নেই। তাছাড়া এখন যাচ্ছেন দুর্ধর্ষ প্রজাদের শাসন করতে—লড়াই ঝগড়ার মধ্যে, সেখানে স্ত্রীলোক নিয়ে যাওয়া যায় না। তবু, চোখে দেখতে দোষ কি?

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে, শহরের উপকণ্ঠে নদীর ধারে কোন এক হিন্দু বানিয়ার বাগানবাড়িতে যেখানে ওরা আড্ডা গেড়েছে—সেই দিকে এগিয়ে গেলেন শাহজাদা আর তাঁর সঙ্গীরা।

সেটা অপরাহ্ণ বেলা, আজও সেই ক্ষণটির কথা স্পষ্ট মনে আছে তাঁর। সূর্য অস্ত যায় নি তখনও, দূর পাহাড়ের দিকে হেলে পড়েছে মাত্র। মাথার ওপরে একটা প্রকাণ্ড সাদা মেঘে সেই রাঙা রোদ পড়ে অদ্ভুত একটা সিঁদুরে লাল আলোর সৃষ্টি হয়েছে। সেই উজ্জ্বল বর্ণাভায় পাশের নদী, দূরের পাহাড়, বাগিচার গাছ-পালা, ফুল-ফল সব যেন নতুন একটা রূপ ধারণ করেছে। এমন কখনও দেখেন নি শাহ্‌জাদা। এ আলো অবশ্য দেখেছেন এর আগে—পুরবীয়ারা বলে 'কনে দেখানো আলো'— কিন্তু সে আলোতে যে প্রকৃতির সুদ্ধ চেহারা পাল্‌টে যায় তা এব আগে কখনও এমন-ভাবে অনুভব করেন নি।

প্রায় কুড়ি পঁচিশটি মেয়ে এনেছে মহাজন আতাউল্লা খাঁ। পুবনো ঘাগী ব্যবসাদার, এই দিকেরই লোক, ব্যবসার খাতিরে বহু দূব দূর দেশে ঘোরে—আবব, ইরাণ, রুম, ইস্তাম্বুল—কোন দেশ বাকী নেই তার। এবার আরও দূরে রুশী মুলুকে গিয়েছিল। মাল চেনে সে, চুনে চুনেই এনেছে। এই একটা কিস্তিতেই খরচ-খরচা বাদ লাখ পাঁচেক টাকা নীট মুনাফা করবে—এই রকম তাব আশা। তার জন্যে চেষ্টারও ত্রুটি রাখছে না। এখানে এসে বিশ্রামই দেওয়াচ্ছে না শুধু, খাওয়া-শোওয়া সব ব্যাপারেই নজর রেখেছে। কতটা খাবার কাকে দেওয়া হবে—তার মাপ আছে। কেউ ঘি খাবে, কেউ খাবে না। কাউকে মাংস দেওয়া হবে, কাউকে শুধু সব্‌জি। বাবুর্চিখানায় নিখুঁত নির্দেশ দেওয়া আছে এসব—হুকুমও খুব কড়া, এর এতটুকু এদিক ওদিক হ'লে শাস্তি পেতে হবে তাদের। এর সঙ্গে আছে নিয়মিত ব্যায়াম, নাচ-গান শেখানোর ওস্তাদ সঙ্গেই যাচ্ছে, এমনি খোলা ব্যায়ামেরও ব্যবস্থা আছে। লড়াইয়ের ঘোড়া যারা বেচতে আসে, তারাও যেমন ঘোড়াকে মেপে খাওয়ায়—চর্বি হয়ে গেলে চলবে না, আবার বেশি রোগা হ'লেও নিতে চাইবে না—দলাই মলাই দৌড করায় নিয়মিত—এখানেও সেই নিয়মেই মেয়েদের

যথেষ্ট লোভনীয় আর 'কিম্‌তী' অর্থাৎ মূল্যবান ক'রে তুলছে আতাউল্লা।

শাহ্‌জাদা যখন পৌঁছলেন তখন এমনি একটা ব্যায়াম করানো হচ্ছে ওদের। নদীর ধারে খোলা জমিনে ঘাসের ওপর অল্প অল্প দৌড়চ্ছে ওরা, কতকটা ঘোড়ার দুল্‌কি চালের মতো ; বেশি দৌড়লে রোগা আর পাকাটে চেহারা হয়ে যাবে, এতে সেটা হবে না ; ভুঁড়ি কমবে কিন্তু নিম্নাঙ্গ ভারী থাকবে।

সবাই সুশ্রী, সবাই অল্পবয়সী—ঠিক যাকে কিশোরী মেয়ে বলে তাই। তার ওপর খাটো পাজামা আর আঁট কুর্তা পরানো হয়েছে, তার ফলে দেহের সুঠাম গঠন চোখে পড়তে কোন অসুবিধা হয় না। নয়নাভিরাম দৃশ্য—মনে মনে স্বীকার করলেন শাহ্‌জাদা।...

আতাউল্লাকে শাহ্‌জাদা চেনেন, এর আগে দেখেছেন—সেও চেনে ওঁকে। দূর থেকে আসতে দেখেই ছুটে গিয়ে রেকাব স্পর্শ ক'রে আনুগত্য জানিয়ে লাগাম ধরে ঘোড়াকে দাঁড় করাল। তার দিকে অবশ্য বিশেষ লক্ষ্য ছিল না শাহ্‌জাদার, তিনি মুগ্ধ দৃষ্টিতে সামনের ঐ অপরূপ দৃশ্যটাই উপভোগ করছিলেন।

সবাই সুন্দর, তার মধ্যে নির্বাচন করা শক্ত, তবু দেখতে দেখতে হঠাৎ একটি মেয়ের মুখে এসেই চোখ দুটো যেন আটকে গেল তাঁর।

ঠিক কি দেখছিলেন, কী দেখে এতটা মোহগ্রস্ত হয়েছিলেন তা হয়ত ভাল বোঝাতে পারবেন না শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজেব কিন্তু আজও, সেই স্মৃতি মনে জাগামাত্র দেহের শিরায় শিরায় তেমনি আগুন জ্বলে উঠল, ধমনীর রক্তস্রোতে তেমনি উন্মাদনা অনুভব করলেন তিনি—সেদিন যেমন করেছিলেন। হ্যাঁ—উন্মত্তই হয়ে উঠেছিলেন সেদিন। তাঁর মধ্যে যে এতখানি কামনা আছে, এত প্রচণ্ড ক্ষুধা—তা ওকে দেখার আগে কখনও বুঝতে পারেন নি। এখনও তাঁর লোমকূপগুলো হর্ষকণ্টকিত হয়ে উঠল সেই দৃশ্য মনে পড়ে।

তেরো কি চৌদ্দ বছর বয়স হবে হয়ত, নিতান্তই বালিকা। অর্ধবিকশিত তো নয়ই, বিকাশোন্মুখও বলা চলে না। ফোটার পূর্বেকার কোরকের মতোই কচি সে। তবু কী যে ছিল তার দুগ্ধশুভ্র বর্ণে, তার নীলাভ চোখে সুঠাম কপোলে আর সুডৌল ললাটে, ধনুকের মতো অপরূপ বঙ্কিম ওষ্ঠাধরে—তার দিকে চেয়ে বহুক্ষণ পর্যন্ত চোখের পলক পড়ল না শাহ্‌জাদার, মনে হ'ল পাথর হয়ে গেছেন তিনি, নিঃশ্বাসটাও বোধহয় ফেলতে পারছেন না. পাছে দেখার ব্যাঘাত ঘটে।

এমন দৃশ্য এর আগে কখনও চোখে পড়ে নি তাঁর। এতক্ষণের পরিশ্রমে ওর শ্বেতবর্ণে একটা লালিমার আভাস লেগেছে, স্বর্ণাভ অলকের কোণে কোণে ফুটে উঠেছে দুটি একটি স্বেদবিন্দু। ঘন ঘন নিশ্বাসে বুক ফুলে ফুলে উঠছে, শুধু নাকে নিশ্বাস নিয়ে পর্যাপ্ত বাতাস পাচ্ছে না, তাই ঠোঁট দুটিও সামান্য ফাঁক হয়ে আছে, তার মধ্য দিয়ে মুক্তোর মতো দাঁতগুলির আভাস পাওয়া যাচ্ছে— সবটা জড়িয়ে যেন কোন শিল্পীর ধ্যানমূর্তি বলে মনে হ'ল শাহ্‌জাদার। কল্পনার মেয়ে এ, রক্তমাংসের নয়। হাত দিয়ে ধরতে গেলে বুঝি স্বপ্নের মতোই মিলিয়ে যাবে, ছোঁয়া যাবে না।···

ওঁর সেই মুগ্ধ দৃষ্টি তার মুখেই নিবদ্ধ হয়েছে বুঝে আরও লাল হয়ে উঠল মেয়েটি। তার ত্বকের শুভ্র উজ্জ্বল বর্ণে ক্ষণে ক্ষণে যে রক্তোচ্ছ্বাস খেলে যাচ্ছে তা দূর থেকেই চোখে পড়ল শাহ্‌জাদার। দেখতে দেখতে সুনিবিড় লজ্জায় তার চোখ দুটি নত হয়ে এল, মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইল সে।

বাকী মেয়েদের চোখে ওঁর এই পক্ষপাত ধরা পড়তে দেরি হয় নি, কৌতুকে ও ব্যঙ্গে তাদের ওষ্ঠ শাণিত হয়ে উঠেছিল কিন্তু সে সব কোন দিকেই খেয়াল ছিল না শাহ্‌জাদার। ওঁর তৈমুরশাহী রক্তে আগুন জ্বলছে তখন, কামনায় আর আবেগে অধীর হয়ে উঠেছেন। যতক্ষণ মেয়েটির চোখে চোখ লেগেছিল ততক্ষণ এতটা বুঝতে পারেন

নি, এখন সে মাথা নামাতেই যেন চমক ভাঙল ওঁর। সঙ্গে সঙ্গে জ্বালাটা আরও বেশি ক'রে অনুভব করলেন। আর ধৈর্য মানল না। ইশারায় আতাউল্লাকে একটু দূরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বিনা ভূমিকাতেই বললেন, 'আতাউল্লা, ঐ মেয়েটিকে আজ রাত্রে আমার চাই, তার জন্যে কত নেবে বলো।'

বেশী বলার ক্ষমতাও ছিল না তাঁর, আবেগের অস্থিরতায় গলা কাঁপছে, আওরঙ্গজেবের পক্ষে যেটা একেবারেই অস্বাভাবিক।

এ চাহনি, এ গলা আতাউল্লা চেনে, পুরুষের এ অবস্থা দেখতে অভ্যস্ত সে। তার মুখ শুকিয়ে উঠল ; তবুও বলল, 'তওবা, তওবা! কী বলছেন জনাবেহকীম, এ সে সব জিনিস নয়। কসবী নয় এরা। এ একেবারে টাটকা ফুল, বাদশার সেবায় লাগার মতো।'

'ওসব কথা আমাকে শুনিয়ে কোন লাভ হবে না।' অসহিষ্ণু শাহ্‌জাদার কণ্ঠ কঠিন হয়ে ওঠে, 'আমার চাই-ই, আর সে কথাটা যত শীগ্‌গির তোমার মাথায় ঢোকে ততই মঙ্গল।'

'কিন্তু বাসি হয়ে গেলে যে ও ফুলের দাম পাবো না হুজুর' আতাউল্লা কাতরভাবে বলে, 'এ কথা চাপা থাকবে না কিছুতেই, তাছাড়া যে নেবে সে যাচাই করে নেবে। এ বহুত কিম্‌তী মাল, বিস্তর টাকা খরচ করেছি আমি, ক্রেস্তানী মেয়ে ও, রুশের বাদশার মুলুক ওদের, অনেক কষ্ট ক'রে অনেক খরচ ক'রে ওকে ওর দেশের বাইরে আনতে হয়েছে। সব বরবাদ হয়ে যাবে বন্দানওয়াজ, এত মেহন্নৎ ঝুটা হয়ে যাবে।'

'ছাখো আতাউল্লা, তুমি আমাকে বিলক্ষণ চেনো। ইচ্ছে করলে আমি এমনিই নিতে পারি, তোমার কিছুমাত্র সাধ্য নেই যে আমাকে বাধা দাও। এক আগ্রায় গিয়ে জাহাঁপনার কাছে নালিশ জানাতে পারো কিন্তু তিনি তোমার এ নালিশে মুচকী হাসবেন শুধু, মনে মনে ছেলের পছন্দর তারিফ করবেন। তা ছাড়া তাঁর দরবারে হাজির হ'তে আমার অনেক দেরি। কাজেই ভাল চাও তো একটা দাম

ঠিক ক'রে নাও ; তোমার পুরো নুকসান ওঠাতে চাই না আমি, তবে বেশি চেও না, তাহ'লে দিতে পারব না।'

'তাহ'লে ওকে একেবারে কিনেই নিন না খুদাওয়ন্দ্! আমি —আমি না হয় অল্প মুনাফায় ছেড়ে দেব। এতই যখন নজর পড়েছে আপনার—। ভাল টাটকা মাল, নাচ-গান-বাজনা সব জানে, কিছু কিছু লেখাপড়াও করেছে, বাদশার বেগম হবার যোগ্যতা ধরে ও।'

'না, অত পয়সা আমার নেই, অভিরুচিও নেই। আমি আজ এখানে আছি, কাল ওখানে। তা ছাড়া বহু দূরের সফর আমার এ যাত্রায়—এর মধ্যে ওসব ঝামেলা জড়াতে চাই না।'

অগত্যা আতাউল্লাকে একটা দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে সত্য অবস্থাটা মেনে নিতে হয়েছিল। বহুদিন যারা ব্যবসা করে—তাদের কিছুটা দার্শনিক মনোভাব জন্মে যায়ই—বাস্তবকে সহজে মেনে নিতে পারে, অকারণ হা-হুতাশ ক'রে সময় ও শরীর নষ্ট করে না। দরদস্তুর সে করে নি। শাহ্জাদার মর্জি আর মেহেরবানির ওপর ছেড়ে দিয়েছিল সেটা। সে জানত সামান্য দু একশ মোহর বেশি বা কমে এ লোকসানের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না, মিছিমিছি কেজিয়া ক'রে লাভ কি। এ শাহ্জাদার একটু কৃপণ বদনাম আছে, চাপ দিলেও বেশি আদায় হবে না।···

সেই রাত্রে সেই বাগান বাড়িরই একটা ঘরে শয্যা রচিত হয়েছিল শাহ্জাদার ; ফুলের কুঁড়ির মতো মেয়েটিকে সেখানেই পাঠিয়ে দিয়েছিল আতাউল্লা। কী যেন নাম বলেছিল মনে নেই আজ, মরিয়ম না কি যেন, আর্মানীরা যে জাতের ক্রেস্তান—সেও তাই। গলায় একটা সরু সোনার হারে ওদের পয়গম্বর যিশুর একটা মূর্তি ঝোলানো ছিল।

ভয়ে উত্তেজনায় অল্প অল্প কাঁপছিল মেয়েটি ; মুখের ওপর দশ বারোটা বাতির মিলিত আলোয় তেমনি ক্ষণে-ক্ষণে-মিলিয়ে-যাওয়া

রক্তোচ্ছ্বাস দেখতে পেয়েছিলেন শাহ্‌জাদা, দেখতে পেয়েছিলেন কেমন একটি একটি ক'রে তার সেই সুন্দর নাকটির ওপর আর ওপরের ঠোঁটে সূক্ষ্ম স্বেদবিন্দু ফুটে উঠছে।···আর বিলম্ব সয় নি তাঁর, দুটো মিষ্টি আশ্বাসের কথা বলার, কি কোন প্রণয়সম্ভাষণেরও চেষ্টা করেন নি—একেবারেই রূঢ় কঠিন হাতে নিজের দিকে আকর্ষণ করেছিলেন।···

আশ্চর্য, মেয়েটি কোন বাধা দেয় নি, অনুযোগ করে নি। নীরবে, যেন স্বেচ্ছাতেই নিজেকে সঁপে দিয়েছে ওঁর সেই নির্দয় বাহুবন্ধনে। বর্বরের মতো, পশুর মতো, বহু শতাব্দী আগের মোঙ্গল পূর্বপুরুষদের মতোই আচরণ করেছেন তার সঙ্গে, কিন্তু তবু তার চোখে এতটুকু ভৎ´সনা ফুটে উঠতে দেখেন নি। বরং, আজ যেন মনে হয়, একটা মুগ্ধ কৃতার্থতাই দেখেছিলেন তার দৃষ্টিতে, একটা সার্থকতা লক্ষ্য করেছিলেন তার নিঃশেষে সঁপে দেওয়ার ভঙ্গীতে!···

রাত্রিশেষে বিদায় নেবার সময় এক থলি মোহর বার করেছিলেন শাহ্‌জাদা, ঈষৎ একটু অপ্রতিভভাবে বলেছিলেন, 'লড়াইয়ে চলেছি, সঙ্গে আওরৎ নেই—কাজেই জেবর-জহরৎও কিছু নেই। এই মোহরগুলো রাখো, মনের মতো জেবর একটা গড়িয়ে নিও। তোমার যা দাম মালিককে দিয়েছি, এটা তোমার বকশিস।'

সে টাকা নেয় নি, সসম্ভ্রমে মাথায় ঠেকিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছে। সহজভাবেই বলেছে, 'আমি যে কেনা বাঁদী মেহেরবান, আমার নিজস্ব টাকা থাকতে নেই। যা দেবেন তাও মালিকেরই প্রাপ্য হবে।'

'তবে তোমাকে কী দিতে পারি বলো' পরিতৃপ্ত শাহ্‌জাদা সেই মুহূর্তে উদার হয়ে উঠেছিলেন, 'বলো তো আতাউল্লাকেই বলে দিই তোমাকে একটা দামী গহনা গড়িয়ে দিতে।'

'সেও মালিকই শেষ পর্যন্ত নিয়ে নেবেন খুদাওয়ান্দ, আমাদের ও সব ভোগে হয় না। নতুন মালিককে যখন বিক্রি করবেন তখন

কি আর জেবর পরিয়ে বিক্রী করবেন? সে মালিক যদি গহনা পরাতে চান তিনিই পরাবেন—সেও তাঁর খুশি আর মর্জির ওপর নির্ভর করছে।…না, না, জনাব, যদি দিতেই চান কিছু তো আপনার ব্যবহার করা অথচ খুব কম-দামী কোন জিনিস দিন, যা আমি অনায়াসে কাছে রাখতে পারব, যা কেড়ে নিয়ে কারও কোন লাভ হবে না, অথচ যা স্পর্শ ক'রে আপনার স্পর্শ অনুভব করব, আর যদি—যদিই কোনদিন ভাগ্য আবার আপনার কাছাকাছি নিয়ে আসে তো যা দেখে আপনিও স্মরণ করতে পারবেন আপনার এই বাঁদীকে।'

মুগ্ধ হয়েছিলেন শাহ্‌জাদা ওর এই অনুরোধে। লজ্জিতও বোধ করেছিলেন একটু! এই যৎপরোনাস্তি অমানুষিক ব্যবহারের পরিবর্তে এতটা সৌজন্য আশা করেন নি তিনি। তাই ওর সামান্য অনুরোধটুকু রক্ষার জন্যে ব্যস্তই হয়েছিলেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে তেমন কোন জিনিসের কথাই মনে পড়ে নি। অসহায়ভাবে বিমূঢ়ভাবে চারিদিকে তাকিয়ে দেখেছিলেন শুধু। এখানে কী আছে এমন তাঁর ব্যবহার করা জিনিস, পোশাক আর হাতিয়ার ছাড়া?

মেয়েটিই ওঁর মনোভাব বুঝে দেখিয়ে দিয়েছিল আংটিটা, 'এটে দেবেন শাহ্‌জাদা? কমদামী আংটি, ওটা কেউ কেড়ে নেবে না হয়ত!'

'এটা? এটা যে আমার মোহর করার আংটি।'

'ও—। বুঝতে পারি নি জনাব-ই-আলি। মাফ করবেন।' সংকোচে যেন এতটুকু হয়ে গিয়েছিল সে, মুহূর্তে ম্লান হয়ে উঠেছিল।

সেই আংটিটার পাশে অনামিকার চৌকো-চুণির আংটিটা দেখিয়ে তাড়াতাড়ি বলেছিলেন শাহ্‌জাদা, 'তুমি বরং এইটে নাও।'

'ওটা এক দণ্ডের বেশি আমার কাছে রাখতে দেবেন না মালিক, অতবড় পাথরের কী কিম্মৎ—কিছুটা আমি জানি।'

সেই সময়েই কথাটা মনে পড়ে গিয়েছিল শাহ্‌জাদার। হঠাৎ

হারিয়ে গেলে অসুবিধা হ'তে পারে বলে এই মোহরের আংটি এক সঙ্গে দুটো করিয়েছিলেন। একটা তাঁর সঙ্গে তাঁবুতেই আছে। এটা খুলে দিলে বিশেষ কোন অসুবিধা হবে না। তিনি আংটিটা খুলে ওর হাতের মধ্যে গুঁজে দিয়ে বলেছিলেন,'বেশ, এইটেই রাখো। সাবধানে রেখো, এটা যে আমার মোহর তা কেউ না বুঝতে পারে! আঙুলে পরতে পারবে না—তবে যদিই পরো, মোহরের দিকটা ভেতরে রেখো।' মাথা নত ক'রে সেই সামান্য দান গ্রহণ করেছিল মেয়েটি, ধন্য হয়ে গিয়েছিল যেন।

বেশীক্ষণ লাগে নি শাহ্জাদার এই স্মৃতি-পরিক্রমা শেষ করতে। ছবিগুলো যেন সাজানোই ছিল মনের মধ্যে পর পর, শুধু এতকাল চোখ বুজে ছিলেন বলেই দেখতে পান নি। একটার পর একটা—ঘটনাগুলো যেন নতুন ক'রে ঘটে গেল আবার, তেমনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন তিনি। মনের মধ্যে ঘটল বলেই বোধ করি অর্ধদণ্ডও লাগল না, কিন্তু সবগুলোই মিলিয়ে পেলেন তিনি। স্মৃতির ভাণ্ডারে সব ঠিক ঠিক জমা ছিল, কোথাও এতটুক ছেদ পড়ে নি, এতটুকুও হারিয়ে যায় নি। সে রাত্রির স্বাদ আজও তেমনি আছে, অনুভূতির তীব্রতাও কমে নি। সেদিনের সেই কামনা, সেই অধীরতা, সেই আনন্দ সেই রকমই অনুভব করলেন আবার। চঞ্চল হয়ে উঠলেন এত দিনের বিস্মৃত সেই সুখস্মৃতিতে। স্থান কাল পাত্র তেমনিই ভুলে গেলেন যেন—সেদিনের মতোই।

হঠাৎ মনে হ'ল—সেই পুষ্পকোরকের মতো কোমল—তেমনি অম্লান তেমনি কচি দেহটা এখনও তাঁর বাহু বন্ধনের মধ্যেই আছে। তিনি সজোরে সবেগে চেপে ধরলেন তাকে।···

একজন ছিল ঠিকই—তবে সেদিনের সেই মেয়েটি নয়। যন্ত্রণায় অস্ফুট একটা শব্দ ক'রে উঠল দেলওয়ার। সেই শব্দেই চমক ভেঙ্গে প্রকৃতিস্থ হলেন শাহ্জাদা, স্বপ্ন থেকে বাস্তবে নেমে এলেন।

মনে পড়ল দেলওয়ারকে কোলের কাছে টেনে আনার কথা। এখনও সে সেইভাবেই আছে, এখনও তার মুখখানা এক হাতে তেমনি তুলে ধরা। কথা কইতে কইতেই তিনি যে চিন্তায় ডুবে গেছেন তা বুঝতে দেরি হয় নি দেলওয়ারের। সে তাঁকে দিন-রাত অখণ্ড মনোযোগে লক্ষ্য করে—তাঁর প্রতিটি ভঙ্গী তার পরিচিত। পাছে এই গভীর চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটে তাই সে একটুও নড়ে নি কাঠের মতো আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে। ভাল ক'রে নিশ্বাসও ফেলতে পারে নি এতক্ষণ।

অপ্রতিভ হলেন শাহ্‌জাদা। যতই হোক, সামান্য এক ভৃত্যের কাছে এতটা আবেগ প্রকাশ করা ঠিক হয় নি। তাঁরও যে সাধারণ মানুষের মতো হৃদয় আছে আর সে হৃদয় তাদের মতোই আবেগের অধীন, এটা অধস্তন কর্মচারী কি ভৃত্যদের না জানাই ভাল। বিশেষ ক'রে এক্ষেত্রে একটু ভুল বোঝার সম্ভাবনা আছে। ও কী ভাবল কে জানে, এই আলিঙ্গন ওরই প্রাপ্য বলে যদি মনে করে তো স্পর্ধা বেড়ে যাবে। সে ভুল এখনই ভেঙ্গে দেওয়া দরকার।

একটু বিরক্তই হলেন তিনি—নিজের ওপরে তো বটেই—ঐ ছেলেটার ওপরেও।

তিনি বেশ একটু জোরেই ঠেলে সরিয়ে দিলেন তাকে। সে বিরক্তি তাঁর ভ্রূকুটিতেও প্রকট হয়ে উঠল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ওর ভয়ার্ত শুষ্ক মুখের দিকে চেয়ে আপনিই কোমল হয়ে এল দৃষ্টি, ভ্রূকুটিও মিলিয়ে গেল। তাঁরও আগে সে-ই নিজেকে অপরাধী মনে করেছে, তেমনিই কুণ্ঠিত দীন তার ভঙ্গী। যেন কোন মতে তাঁর চোখের সামনে থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারলে বাঁচে।

না, আর ভুল করবেন না। যে যথার্থ অনুগত, বিশ্বস্ত—যে তাঁকে ভালবাসে—তার প্রীতি আর বিশ্বস্ততা হারাতে পারবেন না তিনি।

একে দিয়ে অনেক কাজ হবে তাঁর। দেলওয়ার একদিন তাঁর

ডান হাত হয়ে উঠতে পারবে। বড় বংশের, ওমরার ছেলেদের ডেকে বড় বড় পদ দেওয়া যেতে পারে—প্রয়োজন বোধে, রাজনীতির খাতিরে দিতেও হয়—কিন্তু তাদের ওপর ভরসা করা যায় না। তার চেয়ে ঢের বেশী আশা তাঁর এর ওপর। বিশ্বস্ত এবং দক্ষ—এ লোক সর্বকালেই দুর্লভ।...

বিশ্বস্ত অথচ দক্ষ।

এই মুহূর্তে এই রকম লোকেরই একটা একান্ত দরকার।

স্বস্তি পাচ্ছেন না তিনি। কিছুতেই স্থির হ'তে পারছেন না, সত্যটা না জানা পর্যন্ত। সেটা কে জেনে বলবে তাঁকে নিশ্চিত ক'রে!

সে কাজ এই বালকের দ্বারা হবে না।

বাঘের গুহায় গিয়ে তার সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্যে আরও ঢের ঝানু লোকের দরকার।...

কিন্তু—সত্যিই কি হবে না?

অন্যমনস্ক হয়েই চেয়েছিলেন হয়ত—তবু ওর সুকুমার সুশ্রী মুখখানা একেবারে দৃষ্টির বাইরে ছিল না। সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতেই চিন্তাটা খেলে গেল মাথায়।

দুঃসাহসিক পরিকল্পনা—কিন্তু দুঃসাহসেই তো আনন্দ। অন্তত আওরঙ্গজেবের ক্ষেত্রে তাই।

এ সংশয় তাঁর দূর করতে পারে এমন একজনই আছে, যে তাঁকে কাল শেষ রাত্রে ঐ ইঁদুর-কলটা দিয়ে গেছে। তার কথা সাময়িক ভাবে বিস্মৃত হয়েছিলেন ঠিকই, তবে সে তাঁর জানার বাইরে যেতে পারে নি। তার খবর তিনি রাখেন। সে এখন বড়ে শাহ্‌জাদার অন্তঃপুরচারিণী, তাঁর আদরের কাশ্মীরী বাঈ। সেই ক্রীতদাসী, যাকে আতাউল্লা চড়া দামে বেচতে চেয়েছিল। চড়া দামেই বেচেছে সে। দৈবক্রমে শাহ্‌জাদা দারাশুকোও সেই সময়ে কাশ্মীরে গিয়ে পড়েছিলেন, কৌশলে আতাউল্লা মেয়েটিকে তাঁর চোখের সামনে

এনে হাজির করেছিল। বাদশার অনুগ্রহে বড়ে শাহ্‌জাদার অর্থের অপ্রতুল কোনদিনই ছিল না। তিনি চড়া দামেই কিনে নিয়েছিলেন মেয়েটিকে তৎক্ষণাৎ। কাশ্মীর থেকে কেনা বলে দারা আদর ক'রে তার নাম রেখেছেন কাশ্মীরী বাঈ।

এ সবই জানেন আওরঙ্গজেব। আরও জানেন সেই ক্রেস্তানী বাঁদীকে নেকাহ্‌ ক'রে তাকে বেগমের সম্মান দিয়েছেন বড়ে শাহ্‌জাদা। 'অপূর্ব রূপসী সে, রূপসী এবং গুণবতী। লেখাপড়া যা জানে তাতে মুঘল হারেমেও লজ্জা বোধ করার কারণ নেই, তা ছাড়াও নাচ গান চিত্রাঙ্কন সমস্ত কলাবিদ্যাতেই পারদর্শিনী সে। এ মেয়েকে বাঁদী ক'রে রাখতে দারার বিবেকে ও ঔদার্যে বেধেছিল, তিনি তাকে বিবাহ ক'রে বেগমের পদবীই দিয়েছিলেন।

এইখানেই আছে সে, মাত্র হয়ত অর্ধক্রোশের ব্যবধানে। এই আগ্রা শহরেই।

কোন মতে যদি তার কাছে কাউকে পাঠানো যায়—চতুর এবং বিশ্বস্ত কাউকে, তা হ'লেই এই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, এই দ্বিধা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে অব্যাহতি পান শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজেব।

তেমন কেউ নেই। যাকেই পাঠাবেন কথাটা ছড়িয়ে পড়বে, সে বেচারীর প্রাণ নিয়ে টানাটানি হ'বে—যে নিজের প্রাণ বিপন্ন ক'রে তাঁর প্রাণ রক্ষা করতে এসেছিল। যাকে-তাকে এ কাজে পাঠানো চলবে না।

তেমন বিশ্বাসী লোক হাতের কাছে আছে একমাত্র এই বালকটিই।

শুনতে খারাপ লাগবে অনেকেরই—কিন্তু যা সত্য তা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত নন তিনি কোনদিনই।

তবে নিতান্তই অল্প বয়স ওর, এই দুরূহ কাজের ভার কি এর ওপর দেওয়া উচিত হবে?

চিরদিনের দুঃসাহসী মন তাঁর বলে ওঠে, দোষ কি!

যদি বানচাল হয়ে যায় তাঁর মতলব, যদি ধরা পড়ে?

তখন অনেক কৈফিয়ৎ আছে দেবার মতো। সে তখন ধীরে-সুস্থে ভেবে দেখলেই হবে। একটা কথা তিনি নিশ্চিত জানেন, সহস্র অত্যাচার বা প্রলোভনেও দেলওয়ারের মুখ থেকে সত্যটা বার করতে পারবে না ওরা।

শাহ্‌জাদা আস্তে আস্তে দেলওয়ারের মাথায় একটা হাত রাখলেন, বাচ্চা, একটা কাজ করতে পারবি?'

দেলওয়ার এতক্ষণ একটা কঠোর তিরস্কার বা ঐ ধরনের কিছু আশা করছিল, তার পরিবর্তে এই প্রস্তাবে যেন কৃতার্থ হয়ে গেল। সাগ্রহে ঘাড় নাড়ল সে—পারবে।

'না শুনেই ঘাড় নাড়ছিস যে! যে কাজের লোক তার এত তাড়া ভাল নয় কিন্তু—জেনে রাখ!···বিষম শক্ত কাজ, প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়তে পারে—এতটুকু ভুল হলে।'

'তা হোক, তবুও পারব। আপনি হুকুম করলে সবকিছু পারব।'

কঠিন কোন কাজ ক'রে মালিককে খুশি করার সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে দেলওয়ার, তার উৎসাহ এই ধরনের মামুলি ভয় দেখানোতে স্তিমিত হবার কথা নয়।

সে এখনই তৈরী, শুধু কি করতে হবে মালিক যদি অনুগ্রহ ক'রে বলে দেন।

'শোন্ তবে। মন দিয়ে শুনে নে। এত তাড়ার কিছু নেই। এখনই কোথাও যেতে হবে না। দেরি আছে। হয়ত আজও নয়—অন্য কোন্ দিন যেতে হবে, খবর নিয়ে ঠিক করব সেটা। আর এভাবে তোর এই চেহারায় যাওয়া চলবে না। তোকে মেয়েছেলে সাজতে হবে। কেউ না টের পায়, কাউকে বলবি না কথাটা। জানাজানি হ'লে শুধু তোরই না—আরও অনেকের বিপদ ঘটবে। তোর কচি মুখ, মেয়েদের মতোই দেখাবে মেয়েছেলে সাজলে। কেউ অত বুঝতে পারবে না। বিশেষ ক'রে বাতির আলোয় তফাৎ

অত ধরা পড়ে না। আমার বড় বেগম সাহেবার যে দাই আছে বুড়ি, আমিনা বলে, ও আমার ছেলেবেলার দাই, খুব বিশ্বাসী আব আর খুব ঝানু। মেয়েদের সাজাতেও পারে, সেদিক দিয়ে ওস্তাদ। তাকেই বলব তোকে সাজিয়ে দেবার কথা। পোশাক গয়না সে-ই যোগাড় ক'রে নেবে, দরকার হয়তো কাজ চলার মতো পোশাক টেঁকে ছোট ক'রে নিতে পারবে, তোর মাপে। তাকে বলে দেব আমার পাশের এই ঘরে বসে সাজিয়ে দেবে। একেবারে পোশাক পরিয়ে বোরখায় ঢেকে পাল্কীতে রওনা ক'রে দেবে সে, কেউ বুঝতে পারবে না, জানবেও না কেউ। আমিনা কাউকে বলবে না, তুইও বলিস নি। খবরদার। যদি কোনদিন শুনি কাউকে বলেছিস তাহ'লে আর জীবনে মুখ দেখব না তোর।'

শাহ্‌জাদা জানেন, এর চেয়ে বড় শাস্তি দেলওয়ারের কাছে আব কিছু নেই।

দেলওয়ার ঘাড় নাড়ল।

কী করতে হবে বুঝেছে সে—কেন সেইটে কেবল বুঝতে পাবে নি। কৌতুকে আর কৌতূহলে, নতুন এক দুঃসাহসিক কাজেব আগ্রহে তার দুই চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে, স্থির থাকা কঠিন তার পক্ষে। শুধু মনিবের সামনে তাঁর সম্বন্ধে কোন কৌতূহল প্রকাশ করা বেআদবি বলেই চুপ ক'রে রইল। কেমন ক'রে যেতে হবে তা বলেছেন মালিক, কিন্তু কোথায় যেতে হবে আর সেখানে ঠিক কি করতে হবে তা এখনও বলেন নি। সেটা জিজ্ঞাসা করতে পারল না মুখ ফুটে, শুধু উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তাঁর মুখের দিকে চেয়ে। এর বেশী কিছু করার নেই, তাঁর মর্জি-মতো তিনি নিজেই বলবেন।

বললেনও শাহ্‌জাদা, নিজেই বললেন।

ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিলেন, কোথায় গিয়ে কি করতে হবে আর কি বলতে হবে।

এ বিষয়ে তাঁর অসাধারণ খ্যাতি আছে। যখনই কোন অধীনস্থ কর্মচারীকে কিছু কাজের ভার দেন তখন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রতিটি নির্দেশ দিয়ে দেন। কোন ছোট-খাটো তথ্যেও ভুল হয় না। তেমনি তাদের তরফ থেকেও কোন ভুল মার্জনা করেন না। কাজ না হওয়ার কৈফিয়ৎটাই সবচেয়ে অসহ্য তাঁর কাছে।

দেলওয়ারকেও নিখুঁত নির্দেশ দিয়ে দিলেন।

বড়ে শাহ্‌জাদার প্রাসাদে যেতে হবে তাকে। সে যাবে নবাব বাঈ বেগম সাহেবার বাঁদী সেজে। বেগম সাহেবার সন্তান সম্ভাবনা হয়েছে—এই কারণে তিনি অন্য শাহ্‌জাদার বেগমদের উপহার উপঢৌকন পাঠাচ্ছেন। ছলনাটা হঠাৎ ধরা পড়বে না—তিনি অভিনয়টা ত্রুটিহীন করার জন্যে অন্য শাহ্‌জাদাদের অন্তঃপুরেও এমনি ভেট পাঠাবেন। কিন্তু দারা শুকোর অন্তঃপুরে শুধু ভেট পৌঁছে দিলে হবে না, একটা কাজও সেরে আসতে হবে। সেই জন্যেই এত কাণ্ড ক'রে দেলওয়ারকে পাঠাচ্ছেন তিনি। প্রত্যেকটি বেগমের নামে আলাদা আলাদা উপহার থাকবে, যারা বয়ে নিয়ে যাবে তারা সকলেই বোবা, কাজেই তাদের দ্বারা কথা বলার কাজ চলবে না, সেটা বলতে হবে দেলওয়ারকেই। বেছে বেছে বোবা দাসীই রেখেছেন শাহ্‌জাদা, অল্প বয়সে এদের জিভ কেটে বোবা ক'রে দেওয়া হয়েছে—যাতে ঘরের কথা বাইরে না গল্প করতে পারে। তা দেলওয়ারের গলা এখনও মেয়েদের মতোই মিষ্টি আছে, সন্দেহও করবে না কেউ। আর সে যেন লজ্জায় ভাল ক'রে কথা কইতে পারছে না—এমনি-ভাবে ঘাড় হেঁট ক'রে আস্তে আস্তে কথা বলবে, তাহ'লে অত কেউ ধরতেও পারবে না। সে বলবে যে যার যা ভেট বেগম সাহেবাদের বরাবর নিজে হাতে সে পৌঁছে দেবে, মালিকের এই রকম হুকুম আছে।

এইসব উপহারের মধ্যে কাশ্মীরী বাঈ বেগম সাহেবার জন্যেও

কিছু থাকবে। ওদের অন্তঃপুরের কর্তা বৃদ্ধ খোজা জাবেদ আলি তাকে সেখানেও নিয়ে যাবে নিশ্চয়। সেইখানে, ভেট হাতে তুলে দিতে দিতে তাকে দেখাতে হবে এই আংটিটা, বলতে হবে যে মালিক বলে দিয়েছেন যে এই আংটি দেখলেই বেগমসাহেবা বুঝবেন সে বিশ্বাসী লোক। তারপর চুপি চুপি তাঁকে জানাবে যে, মালিক সম্প্রতি একটা চুহাকল উপহার পেয়েছেন, নতুন রকমের চুহাকল বলেই ঠিক বুঝতে পারছেন না, কেমন ক'রে ব্যবহার করতে হয় ওটা। ওতে চুহা কেমন ক'রে জব্দ হবে তাও বুঝতে পারছেন না তিনি। বেগম সাহেবার যদি রহস্যটা জানা থাকে তো যেন মেহেরবাণী ক'রে বলে দেন ওকে।...যেমন ক'রেই হোক কথা কটা বলতে হবে কাশ্মীরী বাঈ বেগমসাহেবাকে। কী জবাব দেন তিনি ধীরভাবে শুনে মনে ক'রে রাখতে হবে। কোন কথা না শুনতে ভুল হয়—গোলমাল না হয়ে যায়। একটা শব্দও ভুললে চলবে না। তিনি যা বলবেন—ঠিক ঠিক শুনতে চান শাহ্‌জাদা।

দু বার ক'রে সব বলে দিলেন তিনি। দরকার ছিল, না, দেলওয়ারের পক্ষে একবারই যথেষ্ট, তবু বললেন। ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিলেন, কাকে কি বলবে, কী আচরণ করবে কার সঙ্গে। তারপর ওর মুখ থেকে সবটা আবার শুনে নিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে। এখন গোসল করে নে আগে। তারপর কিছু খেয়ে নিয়ে তৈরী হয়ে এখানেই বসে থাকবি। সন্ধ্যের আগে যাওয়া যাবে না। দিনের আলোয় হয়ত জাবেদ আলি ধরে ফেলতে পারে, তার নজর বড় সাফ্‌। তাছাড়া, সেই সময় যাওয়াই নিরাপদ, ঐ সময়টায় বড়ে শাহ্‌জাদা আমাদের বা' জান—শাহানশাহের কাছে যান প্রত্যহ। ফিরতে ফিরতে প্রথম প্রহর পেরিয়ে যায়। তিনি থাকলে হয়ত—এই ধরনের ভেট পাঠানো দেখে কিছু সন্দেহ করতে পারেন, না থাকলে অত কেউ মাথা ঘামাবে না।'

এই বলে আবারও ওর মাথায় একটা হাত রাখলেন শাহ্‌জাদা

আওরঙ্গজেব। সস্নেহে ওর চুলগুলো এলোমেলো ক'রে দিয়ে বললেন, 'কী রে, পারবি তো— ? ভেবে ছাখ এখনও। মস্ত বড় ঝুঁকির কাজ কিন্তু। প্রাণ মান ইজ্জৎ—অনেক কিছু চলে যেতে পারে, অনেকের বিপদ ঘটতে পারে।'

উৎসাহে তখন দেলওয়ারের চোখ জ্বলছে। তার ক্লান্তি কোথায় চলে গেছে। এত বড় একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার তার ওপর দেবেন শাহ্‌জাদা—এ তার কাছে অবিশ্বাস্য সৌভাগ্য। এতটা বিশ্বাস আর ভরসা করেন তিনি, তাঁর হুকুম তামিল করতে পারবে না সে! তাহ'লে আর বেঁচে থাকারই বা অর্থ কি!

সে গলায় একটা অস্বাভাবিক ঝোঁক দিয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই পারব।'

'কোন গোলমাল হবে না?'

'কিচ্ছু হবে না। জান কবুল।'

'যদি ধরে ফেলে ওরা—আমার নাম করবি না তো?'

'কিছুতেই না। একটু একটু ক'রে পুড়িয়ে মারলেও বলব না।'

তবু যেন দ্বিধা যেতে চায় না শাহ্‌জাদার। বড্ডই ছোট এ— নেহাৎই বালক। পারবে এতখানি বোঝা বইতে!

একটুখানি চুপ ক'রে থেকে আবারও বললেন, 'ভয় করছে না তোর—একেবারে এমন একা বাঘের মুখের সামনে যেতে?'

'ভয় করবে কেন?' বিস্মিত হয়ে মুখ তুলে তাকাল সে এবার, সরল নির্ভীক পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে। সে চোখে একই সঙ্গে যেন আত্ম-বিশ্বাস আর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রীতি কৃতজ্ঞতা— এবং হয়ত ভালবাসাও উপচে পড়ছে। আশ্বস্ত হলেন শাহ্‌জাদা। তিনি জানেন, যে যথার্থ ভালবাসে সে ভালবাসার পাত্রের জন্য অসাধ্য সাধন করতে পারে।

তাঁর চোখের ওপর চোখ স্থির রেখে দেলওয়ার বলল, 'আমার মালিক ছাড়া আর কাউকে ভয় করি না আমি। তিনি খুশী থাকলে দুনিয়ার কারও নারাজীকে ভয় নেই আমার।'

'দূর পাগল !' আওরঙ্গজেব ওর পিঠে একটা মৃদু চাপড় মেরে বললেন, 'মালিক ছাড়াও একজন আছেন—তাঁকেই সব সময় সব চেয়ে ভয় করতে হয়। মালিকের মালিক তিনি, বাদশারও বাদশা। এক পরমেশ্বর খোদা ছাড়া এ দুনিয়ায় ভয় করার মতো কেউ নেই।'

॥ ৫ ॥

শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজেব যতই অস্থির হয়ে উঠুন, সেদিন আর দেলওয়ারকে পাঠানো গেল না। সেদিনও নয়—তার পরেও কদিন নয়। সন্ধ্যার সময় শাহ্‌জাদার চর সংবাদ নিয়ে এল, শাহানশাহ্ মাত্র কিছুক্ষণ আগে দারার প্রাসাদ ত্যাগ করেছেন। তাও তাঁর তবিয়ৎ ভাল নেই, দুপুর থেকেই বে-এক্তিয়াব হয়ে আছে—প্রচণ্ড মাথা ধরেছে নাকি, তাই যাওয়ার আগেও বড়ে শাহ্‌জাদার সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা বলেন নি, দারা তাঁর সঙ্গে কিল্লা পর্যন্ত গিয়ে পেঁ৷ছে দিয়ে আসবার প্রস্তাব করেছিলেন, বাদশা খুব রূঢ়ভাবে প্রত্যাখান করেছেন। অর্থাৎ শুধু বিরক্তই নয়—তিক্ত হয়ে আছেন তিনি। প্রাসাদে ফিরে গিয়েই নাকি হাকিম তলব করেছেন বাদশা—ঘুমের ওষুধের জন্য। কাজেই আজ রাত্রে আর বড়ে শাহ্‌জাদার প্রাসাদে যাওয়ার কোন সওয়াল উঠছে না।

তার পরও কদিন বাদশা কারও সঙ্গে দেখা করলেন না। তাঁর নাকি সেদিনের পর থেকে মাথা ধরেই আছে। প্রত্যহ শুধু একবার ক'রে রুগ্ন কন্যা জাহান্‌আরাকে দেখতে আসেন—কিন্তু সে সময় সেখানেও অন্য কারও সঙ্গে দেখা করেন না। · এদিকে দারাও ব্যস্ত। তাঁর তৃতীয় ভ্রাতার ব্যবহার বাকী দু'ভাই পাগ্‌লামি বা খাম-খেয়াল বলে উড়িয়ে দিলেও দারা অতটা নিশ্চিন্ত হ'তে পা'রছেন না বোধ হয়। কোন্ সাহসে এবং কী কারণে সে শাহান্‌শার এতখানি রোষও

অগ্রাহ্য করতে পারল, এই অবিশ্বাস্য ধৃষ্টতা প্রকাশ ক'রে ইহকাল পরকাল অর্থাৎ বর্তমান ও ভবিষ্যতের আশা-ভরসা নষ্ট ক'রে বসল! সেই কারণটা না জানা পর্যন্ত যেন দারার স্বস্তি নেই। আওরঙ্গজেবের লোক খবর আনছে—দারা কদিন ধরেই তাঁর অন্তরঙ্গদের সঙ্গে এই প্রসঙ্গ আলোচনা করছেন আর পরামর্শ নিচ্ছেন। নানা অছিলায় তৃতীয় শাহ্‌জাদার বাড়ি লোক পাঠাচ্ছেন তিনি; অসংখ্য গুপ্তচরও নিয়োগ করেছেন। স্বয়ং ওয়াকিয়া নিগার-ই-কুল* ইয়ার আলি খাঁকে ভার দেওয়া হয়েছে সঠিক সংবাদ সংগ্রহের জন্য। খুব সহজে যে তাঁর এই তৃতীয় সহোদরটির পেটের কথা বার করা যাবে না তা দারা জানেন, তাই তাঁর চেষ্টার ও যত্নের ত্রুটি রাখেন নি এতটুকুও, কোন রকম পথই পরিহার করেন নি।

সুতরাং বাধ্য হয়েই শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজেবকে অপেক্ষা করতে হ'ল বেশ কয়েক দিন। এতখানি উদ্বেগের মধ্যে এইভাবে নিষ্ক্রিয় বসে থাকা অপরের পক্ষে অসহ্য হয়ে ওঠার কথা। কিন্তু তিনি ধৈর্য ধরতে জানেন, হতাশ হওয়া বা অস্থির হয়ে উঠে কোন কাজ ক'রে বসা তাঁর স্বভাবে নেই। অধীর হয়ে উঠেছে বেচারী দেলওয়ারই—এত বড় একটা কঠিন কাজের ভার যদি বা তার অদৃষ্টে মিলল, সেটা সুসম্পন্ন করার গৌরব কি আর ভাগ্যে জুটবেই না কোনদিন? ছটফট করে সে, উৎসুক দৃষ্টিতে মাঝে মাঝে মালিকের মুখের দিকে চায়, কিন্তু সে প্রশান্ত ও প্রশস্ত ললাটে একটি কুঞ্চনও জাগে না, চোখের দৃষ্টিতে কোন উত্তরই ফোটে না। মালিককে চেনে সে—তাই মুখ ফুটে প্রশ্ন করতে সাহস পায় না। গোপন কোন কাজের কথা—মালিক নিজে থেকে না তুললে—এমন কি তাঁর সঙ্গেও আলোচনা করতে নেই—এটা ভাল ক'রেই বুঝেছে সে, নইলে এই

*রাজকীয় সংবাদ-সংগ্রাহক—Imperial Staff Reporter.

বয়সে এতটা আস্থাভাজন হ'তে পারত না। মালিক প্রায়ই বলেন, 'যে কথা বলতে বারণ করা হয়—সে কথা সেই মুহূর্তে ভুলে যাওয়াই হ'ল কাজের লোকের লক্ষণ।'

অবশেষে প্রায় দশ বারো দিন পেরিয়ে যাবার পর—তার এবং শাহ্‌জাদার ধৈর্যের পুরস্কার মিলল। খবর পাওয়া গেল শাহানশাহ্‌ এতদিন পরে নিজেই বড়ে শাহ্‌জাদাকে তলব করেছিলেন, কী একটা জরুরী কাজ পড়েছে—পরের দিনই দারা বুলন্দশর যাত্রা করছেন। সেখানে কদিন থাকবেন তা জানা না গেলেও কয়েক দিনেব জন্যে তো নিশ্চিন্ত, যাতায়াতেই তো চার দিন লাগবে, লোকলস্কর নিয়ে যাওয়া!

দারা রওনা হবার পরেব দিনই ভগবানের নাম নিয়ে দেলওয়ারকে পাঠালেন শাহ্‌জাদা। আগের দিনও এমনি ভেট নিয়ে লোক গেছে, শুজা ও মুরাদের বেগমদের জন্যে। শুজাও নাকি সেই দিনই পূর্ব দেশে যাত্রা করছেন—তাব আগে সেখানে পৌঁছনো দরকার। খবর—বিশেষ এই ধরনের খবর অতি দ্রুত হাঁটে—এক শাহ্‌জাদার বাড়ির খবর আর এক শাহ্‌জাদার বাড়ি যেন হাওয়ায় ভেসে পৌঁছে যায়। তা যাবে জেনেই আওরঙ্গজেব দু'দিনে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। তাই দারার বাড়ি যখন ভেট পৌঁছল—তখন কেউই বিশেষ বিস্মিত হ'ল না। বেশী কোন জিজ্ঞাসাবাদও করল না। শুধু জাবেদ আলি একবার দাবার প্রধানা মহিষীর কাছে জিজ্ঞাসা ক'রে নিল যে শাহানশাহ্‌ যার ওপর এত অপ্রসন্ন হয়েছেন—তাঁর বেগমের পাঠানো উপহার নেওয়া ঠিক হবে কিনা; শাহানশাহ্‌ তাতে নারাজ তো হবেন না? বেগম সাহেবা তার উত্তরে আগের দিনের নজীরই দিলেন, ওরা যদি নিতে পেরে থাকে—তাঁদের নিতেই বা দোষ কি? বকুনি খায় তো সবাই খাবে, তাতে অতটা গায়ে লাগবে না।

আসলে কী কী পাঠিয়েছে নবাব বাঈ—সেটা জানতে না পারা

পর্যন্ত কৌতূহল নিবৃত্ত হতে পারছে না। ফিরিয়ে দেওয়া তো অসম্ভব—এইটুকু অপেক্ষারও যেন বিলম্ব সইছিল না।

সুতরাং উপহার-পর্ব নির্বিঘ্নেই মিটে গেল। অন্য সব বেগমদের দেওয়া শেষ হ'লে নবাব বাঈ বেগম সাহেবার খুবসুরৎ খাস বাঁদীটিকে কাশ্মীরী বাঈ বেগমসাহেবার কাছে নিয়ে যাওয়া হ'ল। তালিকায় সেইভাবেই নাম ছিল, যে বাঁদী থেকে বেগম হয়েছে তাকে কিছু—খানদানী ঘরের মেয়ে যাঁরা—তাঁদের আগে ভেট পৌঁছনো যায় না।

এ ঘরের ভেটও সামান্য,—কয়েক শিশি আতর ও একটা রেশমী ওড়না। অন্য ঘর ঘোরার সময় এ ডালার চাপা দেওয়া রুমাল তুলে সবাই একবার ক'রে দেখে নিয়েছে এবং উপহরের অপ্রতুলতায় খুশী হয়েছে, বেগম বাঈ-এর বিবেচনার প্রশংসা করেছে। সুতরাং 'কৌতূহল-অবসান' এ ঘরে কেউই আসে নি দূতীর সঙ্গে। জাবেদ আলিও ওকে কাশ্মীরী বাঈয়ের খাস বাঁদী জহিরণ বিবির কাছে পৌঁছে দিয়ে চলে গেছে। তারও কৌতূহল নেই আর। বড়লোকদের এমন উদ্ভট খেয়াল চাপে মধ্যে মধ্যেই—এ সবে অভ্যস্তই আছে সে। এই দেখতে দেখতে চুল পেকে গেল তার। ছেলে হয় নি এখনও—হবে বা হ'তে পারে এই ফুর্তিতেই কে আবার কবে দান-খয়রাতের বন্যা বইয়ে দেয়। তাও দরগায় সিন্নি পাঠায় কিম্বা বড় পীরের কাছে মানসিক করে—সে এক রকম। জায়েদের ভেট পাঠানো—জাবেদ আলিও দেখে নি, এতখানি বয়সে শোনেও নি কখনও। এদিকে কত তো ভাব ভায়ে ভায়ে—এ ওকে হাতে পায় তো উকুনের মতো নখে টিপে মেরে ফেলে! মরুক গে, বড়লোকের বড় কথা, কিছু বললে কাটা যায় মাথা—চুপ ক'রে থাকাই ভাল। এতকাল বাদশা-শাহ্‌জাদাদের কাছাকাছি থেকে এই সার বুঝে নিয়েছে সে, আর সেই জন্যেই তার এত উন্নতি।......

খবরটা কাশ্মীরী বাঈও পেয়েছিল বৈকি!

আর পেয়ে পর্যন্ত উদ্বেলিত-বক্ষে বসে আছে ভেট কখন এ ঘরে আসবে—এই অপেক্ষায়।

সাগ্রহে শুধু নয়—সোৎকণ্ঠায়।

কারণ তার চিন্তাটা এদের থেকে বহুদূর এগিযে গেছে, প্রায সত্যের কাছাকাছি।

শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজেবের সেদিনকার পাগ্‌লামির বিবরণ সবাই শুনেছে। শুধু এ প্রাসাদে কেন, গোটা শহরেই আব কোন আলোচনা নেই—ঐ কথা ছাড়া। কেউই বুঝতে পারছে না—নানা বকম অনুমানই শুধু করছে, নিজেদের অনুমানে নিজেরাও কোন সদুত্তর পাচ্ছে না। একমাত্র কাশ্মীরী বাঈই বোধ হয় জানে সে আচবণের কারণ। সম্ভবত সেদিনের সেই মধ্য রাত্রির বিপজ্জনক অভিযানেরই ফল ওটা। সেদিনের সে আকুলতা ব্যর্থ হয় নি—শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজেবেব এক রাত্রির নর্ম-সহচবী সেই ছোট্ট সেবিকাটির।

তাই, অসম্ভব জেনেও মনের গোপন কোণে একটা দুরাশা লালন করছিল—ও পক্ষ থেকে একটা স্বীকৃতি একটা কৃতজ্ঞতা আসবার। কে জানে এই উপহারের মধ্য দিয়েই কোন বার্তা আসছে কিনা তার প্রিয়তমের।

খাস বাঁদীর সঙ্গে ডালা বয়ে এনেছিল যে নির্বাক বাঁদী, মহলের ভেতরে তার ঢোকার অধিকার নেই, দোরের কাছ থেকে খাস বাঁদীই সেটা বহন ক'রে এনে বেগম সাহেবার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে ডালাটা সামনে তুলে ধরল। কাশ্মীরী বাঈয়ের খাস বাঁদী জহিরণ বিবি রীতি-মাফিক রুমালটা সরিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল—বেগম সাহেবা একবার হাত ঠেকিয়ে স্পর্শ ক'রে দিলে ডালাটা সে-ই নিযে সরিয়ে রাখবে।

এই স্পর্শ করাটাই হ'ল গ্রহণ করা। বাহক বা বাহিকাদের হাত থেকে দাস-দাসীরাই উপহার তুলে নেয়। কিন্তু কাশ্মীরী বাঈ

সে নিয়ম লঙ্ঘন করলেন, অধীর আগ্রহে নিজেই ডালাটা ধরে নিলেন বাঁদীর হাত থেকে। জহিরণ বিস্মিত হ'ল কিন্তু কিছু বলল না, বরং নিঃশব্দে ঘরের প্রবেশ পথের কাছে এগিয়ে গেল। বোধ করি বেগম সাহেবারই নির্দেশ ছিল এই রকম পাহারা দেবার!

ডালাটা হাত থেকে বেগম সাহেবাই নেবেন—বালিকা বাঁদী বোধ হয় তা আশা করে নি, কিন্তু তাই বলে অপ্রস্তুতও হ'ল না, বরং হাতে তুলে দেবার সময় আর একটা ধৃষ্টতা প্রকাশ করে বসল—বেগম সাহেবার একটা আঙ্গুলে সামান্য একটু চাপ দিল।

চমকে কেঁপে উঠলেন বেগম সাহেবা। এই রকমই আশা করেছিলেন—তবুও কেঁপে উঠলেন, ভয়ে কিম্বা উত্তেজনায়—কিম্বা দুরাশা পূরণের অবিশ্বাস্য সম্ভাবনায়। কিন্তু চমকের সেই-ই শেষ নয়—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যেন তাঁর হৃদস্পন্দন ক্ষণেকের জন্য থেমে গেল—বাঁদীর প্রসারিত হাতে একটি বিশেষ পরিচিত আংটি।

শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজেবের মোহর দেওয়ার আংটি। মোহর-ই-সুলেমান।

এই বালিকার মুখের দিকে চেয়ে মনেই হয় না যে শাহ্‌জাদা এর মারফৎ কোন সংবাদ বা বার্তা পাঠিয়েছেন। কিন্তু আংটিটাও ভুল হবার কোন সম্ভাবনা নেই। এ ওর বিশেষ পরিচিত। বুকের মধ্যে থাকে তার, অথবা মাথার চুলে। এখনও তার বেণীর মধ্যে লুকনো আছে। তার অতি প্রিয় আংটি—প্রিয়তমের স্মারক।

কিন্তু এত ভাবার সময় নেই, বাড়তি প্রশ্নেরও না। যে কোন মুহূর্তে কোন সাধারণ দাসী বা প্রহরিণী এসে পড়তে পারে, ঈর্ষাতুর অন্য বেগমরা তো নানা ছুতোয় কেবলই লোক পাঠান এ মহলে, কোন দোষ ত্রুটি বা বে-আইনী কোন আচরণের সূত্র খুঁজতে। সুতরাং তিনি তখনই হেঁট হয়ে, প্রায় ওর কানের কাছে মুখ এনে প্রশ্ন করলেন, 'কোন খৎ আছে?'

ঘাড় নাড়ল বাঁদী।

'কোন খবর ?'

হ্যাঁ, খবর একটা আছে।

এমন কিছু নয় অবশ্য। বলবার মতো কিছু নয়। খবরটা ঠিক বেগম সাহেবার নয়, শাহ্‌জাদার। সেদিন থেকে শাহ্‌জাদা একটা বড় ধাঁধায় পড়েছেন। ধাঁধার খবরটা বিশেষ কেউ জানে না, এই বাঁদী জানে শুধু। সমস্যা একটা চুহা ধরা কল নিয়ে, একদিন মাঝ রাত্রে কে এক লৌণ্ডী এই চুহাকলটা ভেট দিয়ে গেছে। কে দিয়ে গেল কেন দিয়ে গেল—তা তিনি বুঝতে পারছেন না, আরও মজা, কেমন ক'রে এ কল পাততে হয় তাও জানেন না। বাজারে যে কল পাওয়া যায়—এ ঠিক তা নয়। অথচ চুহাকল একটা শাহ্‌জাদার খুব দরকার, চুহা আর ছুচ্ছুন্দরের উৎপাতে অস্থির হয়ে রয়েছেন। কিন্তু এটার খবর ঠিক জানেন না বলেই কাজে লাগাতে পারছেন না।

দ্রুতই বলে গেল দেলওয়ার। দ্রুত আর নিম্ন কণ্ঠে।

কাশ্মীরী বাঈও সেইভাবেই উত্তর দিলেন।

তিনি বুঝতে পেরেছেন বাঁদী কোন্ চুহাকলের কথা বলছে। তিনিও এমনি একটা চুহাকল গড়িয়েছেন। ভারী মজার কল, দরজাটা পড়ে যখন তখন একটুও শব্দ হয় না, তেমনি ভেতরের শব্দও বাইরে আসে না, ইঁদুর কলে পড়ে যতই চিৎকার অর্থাৎ কিচ কিচ করুক—গৃহস্থের ঘুম ভেঙ্গে বিরক্তির কারণ ঘটে না। গৃহস্থ টেরও পায় না—ইঁদুর পড়ল কিনা। আরও একটা ভারী সুন্দর ব্যবস্থা আছে—ইঁদুর মারার ব্যাপারটাও চমৎকার। সাধারণ কলে মারবার জন্যে বার করলে অনেক সময় চুহা পালিয়ে যায়, এতে তার কোন দরকারই নেই—কলের ওপর দিকে একটা চোরা দরজা আছে, কলটা সুদ্ধ জলে ডোবালেই সেই দরজা আপনি খুলে গিয়ে ভেতরটা জলে ভরে যায়—ইঁদুর চুবুনি খেয়ে হাঁপিয়ে মরবে অথচ সেদিক দিয়েও বেরোতে পারবে না।

স্থির হয়ে মন দিয়ে শুনল নবাব বাঈ বেগম সাহেবার এই

একরত্তি খাস বাঁদী! তারপর হেঁট হয়ে বেগম সাহেবার সালোয়ারের প্রান্ত কপালে ঠেকিয়ে বলল, 'ভালই হ'ল, আমি গিয়ে আমার বেগম সাহেবাকে বলব—তিনি বুঝিয়ে দেবেন শাহ্‌জাদাকে।'

এতক্ষণ নিখুঁত অভিনয় চলছিল—দু' পক্ষেই। কিন্তু কাশ্মীরী বাঈ শেষ রাখতে পারলেন না। একবার দ্বারপথের দিকে চেয়ে হঠাৎ বাঁদীর হাত দুটো ধরে বললেন, 'তুমি কে তা জানি না, তবে বুঝেছি যে তাঁর বিশ্বস্ত লোক। তাঁকে—তাঁকে তুমি আমার নাম ক'রে বলো যে আমার জিন্দিগী আর তকদির তাঁর পায়েই বিকিয়ে আছে চিরদিনের মতো। এই আশায় শুধু বেঁচে আছি যে আর একবার তাঁর দেখা পাবই। তিনি আমাকে না ভুলে থাকেন—না ভুলে যান।···বলবে তো তাঁকে, বলতে পারবে তো কথা কটা? ···আর যদি তিনি কিছু বলেন, তুমি এসে একবার বলে যেতে পারবে না? একটা আশার বাণী শোনার জন্যে মনে মনে হাহাকার ক'রে মরছি। তুমি এসো—মেহেরবানী ক'রে এসো। মঙ্গলবার আর বৃহস্পতিবার রাত্রে আমার এই খাস বাঁদী জহিরণের ভাই বাগানে পাহারায় থাকে। যদি তুমি আসবে বলো, ঐ দুদিনই জহিরণ তোমার জন্যে রাত বারোটায় অপেক্ষা করবে। বাগানের উত্তর দিকের দেওয়ালের কাছে যেখানটায় একটা দেওদারে আর চেনারে জোড় বেঁধেছে—সেইখানে আমগাছের তলায় থাকবে ঐ দুদিনই, বারোটা থেকে একদণ্ডকাল পর্যন্ত, তুমি পাঁচিল টপকে নামলে ও-ই সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবে আমার কাছে, আবার কথা শেষ হ'লে পৌঁছে দিয়ে আসবে। ওর হাতে হাতিয়ার থাকে, ও সঙ্গে থাকতে তোমার অন্তত কোন ভয় নেই। মনে থাকবে তো কথাটা?'

'থাকবে মালেকান?'

'আমি আশা করব তো?'

'যদি বেঁচে থাকি তো, আসবই।'

'তোমার—তোমার নাম কি ভাই?'

মুহূর্তকয়েক ইতস্ততঃ করল বাঁদী, তারপর বলল, 'আমি মেয়ে নই, আমার নাম দেলওয়ার হোসেন।'

কাশ্মীরী বাঈ স্থানকাল পাত্র ভুলে দেলওয়ারের হাত দুটো ধরে বললেন, 'তুমি—তুমি আসবে তো বাচ্চা, আমাকে মিথ্যে স্তোক্ দিচ্ছ না তো? তাঁর দুটো কথা শুনব—এই আমার আশা, আর কিছু নয়।'

দু' চোখে জল ভরে এসেছিল কাশ্মীরী বাঈয়ের।

অসামান্যা সুন্দরী কাশ্মীরী বাঈ। আশ্চর্য সুন্দর তাঁর চোখ।

সে চোখে জল দেখলে বিচলিত হবারই কথা। দেলওয়ার তাঁর দুটি হাত নিজের কপালে ঠেকিয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই আসব মালেকা, কেউ আমাকে রুখতে পারবে না। আমার মালিকের খবর আমি আপনাকে শুনিয়ে যাবোই। খোদার নাম ক'রে জবান দিয়ে যাচ্ছি, আমার কাছে তাঁর চেয়েও বড় যে—সেই মালিকের নাম ক'রে বলে যাচ্ছি।'

॥ ৬ ॥

আওরঙ্গজেব মনোযোগ দিয়ে শুনলেন সব কথা। জেরা ক'রে ক'রে যাচাই ক'রে নিলেন আর একবার।

শেষের কথাগুলোও শুনলেন। গম্ভীর হয়ে উঠলেন তিনি।

ঈষৎ তিরস্কারের সুরেই বললেন, 'এই জন্যেই এ সব কাজে ছেলেমানুষদের পাঠাতে নেই। অনেকগুলো অন্যায় ক'রে এসেছ তুমি। প্রথমত তোমার পরিচয় দেওয়া ঠিক হয় নি। কারও কাছেই বলবে না, এই কথাই বলা ছিল। মেয়েদের বিশ্বাস করতে নেই—ওরা আবেগের তুবড়ি এক একটা। তারপর আমার হুকুম ছাড়া এ ধরনের জবান দিয়ে আসা উচিত হয় নি, তুমি আমার কাজে গেছ—বলে আসা উচিত ছিল যে মালিক যদি হুকুম দেন তো

আসব। ভাগ্যের সঙ্গে বার বার চালাকি করতে যাওয়া ঠিক নয়, ওতে খোদা নারাজ হন। তাছাড়া, বাঘের গুহা থেকে একবার নিরাপদে ফিরে এসেছ বলে সে বাঘের দাঁত-নখে ধার নেই এমন কথা বোঝায় না। বিপদকে তাচ্ছিল্য দেখায় আহাম্মকরা। আর সবচেয়ে বড় গুনাহ্—আল্লার নাম ক'রে কিরা খাওয়া। কখনও এ কাজ করবে না আর। এত তুচ্ছ কাজে আল্লার নাম নিতে নেই। পরমেশ্বরের নামের সঙ্গে আমার নাম যুক্ত ক'রে আরও বড় অন্যায় করেছ। আমি তাঁর বান্দার বান্দা, খাদেমের খাদেম। তিনি বাদশারও বাদশা। তাঁর বড় কেউ নেই—বলে দিয়েছি না।'

ঘাড় হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে রইল দেলওয়ার। তারও দুই চোখে জল ভরে এসেছিল, প্রাণ-পণে সেটা দমন করছিল, মালিক না দেখতে পান। মালিকের অবশ্য সেদিকে চোখও ছিল না। তিনি ওকে আর একবার ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক ক'রে দিয়ে বিশ্রাম করতে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর এখন চিন্তার শেষ নেই। অকূল সমুদ্রে যে ভাসছে তার অপরের মনোভাব নিয়ে মাথা ঘামানো চলে না।

দেলওয়ারকে বিদায় দিয়ে পাশের নিভৃত শয়ন কক্ষে এলেন। খাবাসকে আগেই সরিয়ে দিয়েছেন। এখন খানিকটা একা থাকতে হবে, একেবারে একা। নিজের সঙ্গে এখন একটু আলোচনা করা দরকার।

শোবার ঘরে এলেন, কিন্তু বিছানায় বসলেন না, পিছন দিকে দুই হাত বদ্ধ ক'রে তাঁর অভ্যস্ত চিন্তার ভঙ্গীতে পায়চারি করতে লাগলেন। ঘর ছোট—কিন্তু একটি ছোট্ট বিছানা ছাড়া আর কিছুই নেই বলে কোন অসুবিধা হ'ল না। বিছানা আর পাশে একটা চৌকীতে রাখা আধার সুদ্ধ একখানা কোরাণ ও জপের মালা, মাথার কাছে কুলুঙ্গীতে এক সুরাই জল—এ ছাড়া এ ঘরে কিছুই নেই, মেঝেতে কার্পেট সুদ্ধ নেই একখানা। আরামের অভ্যাস ভাল না, তাতে পরিশ্রমের শক্তি কমে যায়, বুদ্ধিতে জড়তা

আসে। পুরুষের জন্যে আরাম নয়—আওরঙ্গজেব মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন।

অনেকক্ষণ ধরে এমনি নিঃশব্দে পায়চারি করলেন শাহ্জাদা। চিন্তার যেন কূল-কিনারা পাচ্ছেন না। তহ্খানার লোহার কপাটটা দেখে ইঁদুর কলের ইঙ্গিতটা বুঝেছিলেন বটে, কিন্তু তবু তখনও ঠিক ষোল আনা বিশ্বাস করতে পারেন নি, কতকটা সন্দেহের ওপরই অতখানি দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। যাচাই ক'রে নেবার সময় ছিল না বলেই কাজটা করতে হয়েছিল। এখন এ আবার কি শুনলেন। এ যে আরও অবিশ্বাস্য। বন্দী করাও অন্যায়—কিন্তু হত্যার ষড়যন্ত্র? এতটা কি সম্ভব? দারা এতটা ভাবতে পারবেন?

বিশ্বাস হয় না। এখনও হচ্ছে না। কিন্তু কাশ্মীরী বাঈই বা মিথ্যা বলবে কেন? এত গরজ ক'রে এতখানি মিথ্যা বলতে যাওয়ার তার দরকার কি ছিল? ওঁর মনের সামনে আসা? ওঁর কৃতজ্ঞতা অর্জন করা? ঠিক মনে হয় না তা। এতকাল চুপ ক'রে ছিল যে—আজ তার এমনি একটা এই আজগুবি—কিস্সা কাহানীর মতো বিচিত্র সংবাদ নিয়ে এতকাণ্ড ক'রে নিজের প্রাণ বিপন্ন করতে আসার কী এমন তাড়া পড়ল? এমন ভয়ঙ্কর কল্পনা ঐটুকু মেয়ের মাথাতে যাওয়াও খুব স্বাভাবিক নয়।

না, এ গরজ ভালবাসার। যে কোন কারণেই হোক, কাশ্মীরী বাঈ তাঁকে ভালবেসেছিল সেদিন, আজও হয়ত বাসে। এ গরজ সেই ভালবাসারই।

কিন্তু তাই বলে দারা এমনটা করবেন! দারা!

শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহানশার। পিতার প্রিয়তম পুত্র। পিতৃভক্ত, উদার, মহৎ দারা! কী বিশ্বাসই না করেন বাদশা তাঁকে!

দারা অকর্মণ্য অপদার্থ—এই কথাই জানতেন, কিন্তু শয়তান? অকর্মণ্য লোক এত বড় শয়তানীর কথা ভাবতে পারে?

হয়ত অকর্মণ্য বলেই পারে। এমন নির্বোধের মতো কাজ আর

কে করতে যাবে। আরও মনে হ'ল—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই--নিজের ধর্মেই আস্থা নেই দারার, তার কাছে আর এর চেয়ে বেশী কি আশা করা যায়! দারা নাকি দার্শনিক, বেদান্তবাদী। কাফের বলেন তাকে আওরঙ্গজেব, কিন্তু কাফেরদেরও একটা ধর্ম আছে, তারা তাতে বিশ্বাসী। দারা কোন ধর্মেই পুরো বিশ্বাসী নন। যে দার্শনিক তার কাছে মায়া মমতা, ঐহিক সম্পর্ক—এ সবের মূল্য কি? তিনি নাকি সুফী আর কাফের পণ্ডিতদের সঙ্গে এইসব আলোচনাই করেন। তাঁর মতে নাকি এই সৃষ্টি এই দুনিয়া—সব-কিছুই মিথ্যা, মায়া। তাই যদি হয় তো বাবা ভাই এদের সম্বন্ধেই বা মাথাব্যথা থাকবে কেন?

কিন্তু এ সব তত্ত্বের কথা।

স্থূল কথা যেটা—সেটা কি শাহানশাহ্‌কে বিশ্বাস করানো যাবে? প্রমাণ কোথায়? দারার কোন দোষ নিজের চোখে দেখলেও বিশ্বাস করেন না বাদশা, এ তো ভিত্তিহীন প্রমাণহীন একটা অনুমানের কথা। আওরঙ্গজেবের নিজেরই যা বিশ্বাস হচ্ছে না—তা ঐ স্নেহান্ধ পিতাকে বিশ্বাস করাবেন কী ক'রে?

তা হ'লে?

একথা তুলতেই তো পারবেন না প্রথমত। কাশ্মীরী বাঈয়ের নাম করা যাবে না। যে এতটা করল তাকে বিপন্ন করতে পারবেন না শাহ্‌জাদা। যারা বলে নিজের স্বার্থের জন্য তৃতীয় শাহ্‌জাদা সব করতে পারেন—তারা ওঁকে সম্পূর্ণ চেনে না বলেই বলে। এতকাল শুধুই নিজের স্বার্থ তিনি দেখেন নি ভাইদের মতো। তিনিই শাহান্‌শার একমাত্র পুত্র—যিনি জ্ঞানমতো, বিবেকমতো পিতার নির্দেশ যথাসাধ্য পালন করেছেন, কর্তব্যে অবহেলা করেন নি। তার বদলে পুরস্কার পান নি কিছুই, বরং বারবার, দারা—এই দারারই চক্রান্তে তিরস্কার লাভ করেছেন। তবু আজও এই সাম্রাজ্যের, মুঘল রাজশক্তির বা বাদশার কোন ক্ষতি হয় তা কখনও

করেন নি। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি, যতদূর জানা আছে তাঁর, দীনিয়াৎ আর হাদিস লঙ্ঘন করেন নি। কোন ঐহিক লাভের আশাতেই না।

না, কাশ্মীরী বাঈয়ের ওপর এতখানি অবিচার তিনি করতে পারবেন না। 'কেউ একজন বলেছে' এমন কথাও বলা চলবে না। কে জানে, হয়ত সেই সূত্র ধরেই কাশ্মীরী বাঈয়ের যোগাযোগ খুঁজে বার করবে। আর বলেই বা লাভ হবে কি? প্রমাণ না দিতে পারলে এ অভিযোগ ক'রেও লাভ নেই, সবটাই তাঁর অপরাধী মনের কল্পনা বলে গণ্য হবে।

অথচ কোন একটা প্রতিকার না করলেও নয়। অবস্থা কঠিন হয়ে আসছে তাঁর। মাসোহারা সত্যিই বন্ধ করেছেন বাদশা, যে তারিখে খাজাঞ্চীখানা থেকে টাকা পাওয়া যায় সে তারিখে মুনীমকে পাঠিয়েছিলেন শাহ্‌জাদা, শূন্য হাতে ফিরে এসেছে। বিপুল খরচা তাঁর, শাহ্‌জাদাকে শাহ্‌জাদার মতোই থাকতে হয়। অকারণ বিস্তর ব্যয় হয় তাতে। আজ হঠাৎ হাত-গুটোনোও সম্ভব নয়। এখনও কিছু টাকা হাতে আছে, কিন্তু এখানে থাকলে ছমাসের বেশি চলবে না। বাদশার অসন্তোষের কথা ইতিমধ্যেই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, তার ফলে কোন মহাজনই তাঁর লোককে ধারে কোন মাল বেচতে চাইছে না। প্রত্যেকটি জিনিস নগদ টাকায় কিনতে হচ্ছে। রাজকর্মচারী ও ওমরাহের দল বিষাক্ত কুষ্ঠরোগীর মতো তাঁর সঙ্গ পরিহার ক'রে চলেছেন। তিনি উপবাস ক'রে মরছেন শুনলেও কেউ এক পয়সা দেবে না।

কেবল একজন ছাড়া।

আত্মীয়দের মধ্যে মাত্র একজনই এখনও তাঁকে ত্যাগ করে নি।

তাঁর ভগ্না জাহান-আরা।

বিপদে না পড়লে আত্মীয় বন্ধুদের ঠিক চেনা যায় না—এই সত্যটাই এবার নতুন ক'রে উপলব্ধি করলেন শাহ্‌জাদা।

জাহান-আরা অসুস্থ, বলতে গেলে মৃত্যুর দ্বার থেকে ফিরে এসেছেন, জীবনের আশঙ্কা গেলেও সুস্থ হয়ে কাজকর্ম দেখতে এখনও দীর্ঘকাল দেরি হবে—সম্পূর্ণ শয্যাশায়িনী, তবু তিনিই সকলের আগে শাহ্‌জাদার সঙ্কট অনুমান ক'রে উপযাচক হয়ে এক লক্ষ টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন। নিজের কর্মচারী দিয়ে নিজের টাকা—সেই সঙ্গে অতি বিনীত অনুরোধ জানিয়েছেন, ভাই যেন দয়া মনে না করেন, উপহার হিসাবেই গণ্য করেন।···যেন দয়া মনে করলেও শাহ্‌জাদার ফিরিয়ে দেবার ভরসা হ'ত!

পায়চারি করতে করতে সহসা থেমে গেলেন আওরঙ্গজেব।

অকস্মাৎ যেন চমক ভাঙল তাঁর।

এই তো—একটা পথ খোলা রয়েছে এখনও।

জাহান-আরাকে দিয়েই বলাবেন নাকি?···যদি কেউ পারে বাদশার কাছে কথাটা পাড়তে তো তিনিই পারবেন। বাদশা তাঁর বড়ছেলের থেকেও যদি কাউকে বেশী ভালবাসেন তো সে তাঁর এই বড় মেয়েটিকেই। এবারের এই দুর্ঘটনায় বাদশা যে পাগল হ'তে বসেছিলেন—এ তো সকলেই দেখেছে। মুঠোমুঠো বললে কম বলা হবে, হাজার হাজার টাকা দান করেছেন প্রত্যহ সাধু-ফকীর-ভিখারীদের—যদি তাদের মিলিত শুভেচ্ছায় মেয়ের জীবন ফিরে পান। সুতরাং দারার বিরুদ্ধে যদি কোন কথা বাদশা শোনেন তো একমাত্র জাহান-আরার মুখ থেকেই শুনতে পারেন।

কিন্তু জাহান-আরা কি বলবেন? আওরঙ্গজেবের মুখ আবার অন্ধকার হয়ে ওঠে। দারার প্রতি তাঁর পক্ষপাত কে না জানে! যে ভাগ্যবান তার সবদিকেই সুবিধা, পিতার প্রশ্রয় তো আছেই, আবার পিতা যাকে সর্বাধিক স্নেহ করেন সেই জাহান-আরাও দারাকে সব ভাইয়ের চেয়ে বেশী ভালবাসেন, আর সেটা দারার বিপুল একটা ভরসা ও আশ্রয়।

আওরঙ্গজেব আবারও অস্থির হয়ে পায়চারি শুরু করলেন।

জাহান-আরা দারাকে বেশী ভালবাসেন এও যেমন সত্য, তেমনি কোন কারণেই যে তিনি কোনদিন অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন নি, সেও তো তেমনি সত্য। এটুকু আওরঙ্গজেবও মানতে বাধ্য; মিথ্যাচরণ বা মিথ্যাভাষণ—এসব দোষও জাহান-আরাকে কেউ দিতে পারবে না। কারও প্রতি কোন অন্যায় হয়েছে জানলে তিনি বাদশাকেও স্পষ্টাক্ষরে 'বলতে পিছ্‌পা হন না কোনদিন। তাঁর ন্যায়-অন্যায়ের বিচারও তাঁর নিজস্ব, যা কর্তব্য বলে জানেন তা থেকে ভ্রষ্ট হন না। তা নইলে, স্বয়ং বাদশা ও বড়ে শাহ্‌জাদার প্রতি অসম্মান দেখিয়ে আতিথ্যের অমর্যাদা ক'রে তাঁদের বিরাগভাজন হয়েছেন জেনেও, আওরঙ্গজেবকে অর্থ সাহায্য করতে সাহস করতেন না।

যা থাকে অদৃষ্টে, জাহান-আরাকেই ধরবেন তিনি। আবারও একটা জুয়াখেলার বাজী ধরতে যাচ্ছেন হয়ত, কিন্তু তাছাড়া তো আর কোন পথও খোলা নেই।

একটা সুবিধা আছে, ভগ্নার এই আকস্মিক পুড়ে যাওয়ার কথা শুনে তিনি যে সুদূর দাক্ষিণাত্য থেকে প্রধানত তাঁকেই দেখতে এসেছিলেন, একথাটা জাহান-আরাও জানেন। আর সে কারণে মনে মনে খুশীও আছেন নিশ্চয়। অন্তত দেখা করতে যাওয়ার প্রস্তাবে আপত্তি করবেন না।

মন স্থির করার সঙ্গে সঙ্গে যেন অনেকটা সুস্থ বোধ করলেন শাহ্‌জাদা। তখনই এ ঘরে এসে ভগ্নীকে খৎ লিখতে বসলেন।

অনেক ভেবে গুছিয়ে একটা সংক্ষিপ্ত পত্রই লিখলেন:

'মাননীয়া ভগ্নী জাহান-আরার যদি আপত্তি বা অসুবিধা না থাকে তো তাঁর অনুগত ভাই আওরঙ্গজেব একবার কাল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতে চান। আর হয়ত বেশি দিন তাঁর আগ্রায় থাকা সম্ভব হবে না, এখানের খরচ চালানোর মতো সামর্থ্য আর তাঁর নেই, ভগ্নীর সময়োচিত স্নেহের দান না পেলে একদিনও থাকতে

পারতেন কিনা সন্দেহ—যাওয়ার আগে ভগ্নীর সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যেতে না পারলে খুবই আপসোস থেকে যাবে তাঁর। কখন গেলে সুবিধা হ'তে পারে যদি দয়া ক'রে শাহ্‌জাদী সাহেবা জানিয়ে দেন তো তাঁর দীন ও অনুগত ভাই আওরঙ্গজেব বড়ই সুখী হবেন।'

জাহান-আরা চিঠিটা পেয়ে একটু হেসেছিলেন মনে মনে। এ চিঠি অনেকদিন ধরেই আশা করছেন তিনি। দেখা করার একটিই মাত্র অর্থ হয়—'বাদশাকে বলে মিটিয়ে দাও ব্যাপারটা।' এই অনুরোধ। আর সেই সঙ্গে আরও কিছু টাকাও চান বোধহয় ভাই সাহেব। অবস্থা যে রীতিমতো সঙ্গীন হয়ে উঠেছে তা চোখে না দেখেও কী আর জাহান-আরা বুঝতে পারছেন না!

হেসেছিলেন, তাই ব'লে সাগ্রহ এবং সাদর আমন্ত্রণ জানাতেও বিলম্ব করেন নি। এখনও হাকিম সাহেব তাঁকে চলাফেরা করার অনুমতি দেন নি, নইলে জাহান-আরাই যেতেন ভাইসাহেব আর ভাবীদের সঙ্গে দেখা করতে। ভাই যদি দয়া ক'রে আসেন তো জাহান-আরার চেয়ে সুখী আর কেউ হবে না। তিনি যখনই আসতে চাইবেন সেইটেই সুসময়। বোনের কাছে ভাই আসবে তার আবার সময় কি?...

কিন্তু আওরঙ্গজেব এসে—জাহান-আরা যা ভেবে রেখেছিলেন—সে দুটি প্রসঙ্গের ধার দিয়েও গেলেন না।

মনেই হ'ল না যে শাহ্‌জাদা কোন মতলব নিয়ে এসেছেন।

স্বাভাবিকভাবেই কুশল-প্রশ্ন করলেন তিনি। ভগ্নী যে বড় কৃশ হয়ে পড়েছেন, এখনও তাঁর দেহে যথেষ্ট রক্ত ফিরে আসে নি—সেজন্য বারবার উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। যে দুটি বাঁদী তাঁর সালোয়ারের আগুন নেভাতে গিয়ে নিজেরা পুড়ে গিয়েছিল—তাদের কুশল জানতে চাইলেন। তাদের কর্তব্যজ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। সব

শেষে ভগ্নীর কোন প্রিয় সাধন করা যদি তাঁর সাধ্যের মধ্যে থাকে তো ভগ্নী যেন নিঃসংকোচে তাঁকে আদেশ করেন—বারবার সে অনুরোধ জানাতে লাগলেন।

অর্থাৎ জাহান-আরার স্বাস্থ্যের প্রসঙ্গেই আলাপটা সীমাবদ্ধ রইল প্রধানত। তবে শাহ্জাদা কিছু নূতন কথাও বললেন। বললেন, 'তোমার এ দুর্ঘটনা খুবই আপসোসের ব্যাপার, তুমি যে কী পরিমাণ কষ্ট পেয়েছ তাও বুঝতে পারছি—সামান্য কোথাও তাপ লাগলে আমাদের সে জ্বালা অসহ্য মনে হয়, তোমার তো এতখানি পোড়া, অসহ্য যন্ত্রণাই পেয়েছ নিশ্চয়, তবে এ থেকে আমার একটা বড় শিক্ষাও লাভ হ'ল। বুঝলাম যে সব ঘটনারই ভালমন্দ দুটো দিক আছে —একেবারে খারাপ ঈশ্বরের রাজত্বে কোন কিছুই ঘটে না।'

'কিন্তু সেটা আমার বেলায় খাটছে কী ক'রে? আমি তো কষ্টই পেলুম, তবে বলতে পারো আমাকে উপলক্ষ ক'রে হাকিমদের জায়গীর হয়ে গেল, গরীব দুঃখীরা বিস্তর টাকা পেল।'

অবাক হয়েই প্রশ্ন করেন জাহান-আরা। তাঁর এই দুর্ঘটনায় তাঁর এ সৃষ্টিছাড়া ভাইটি আবার ভাল কি দেখতে পেল! তিনি যেভাবে পুড়েছিলেন তাতে বাঁচবারই তো আশা ছিল না। বেঁচে গেছেন সেটা পীরফকীরদের আশীর্বাদ কিন্তু প্রথম দুটো মাস যে অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করেছেন—তা যেন তাঁর অতি বড় শত্রুকেও না সইতে হয়।

আওরঙ্গজেব তাঁর বিস্ময় লক্ষ্য ক'রে হেসে ফেললেন, 'দ্যাখো বহিন, পরমেশ্বর খোদা কখনই কাউকে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ দেন না। কষ্ট পেয়েছ ঠিকই—কিন্তু এ ঘটনা না ঘটলে—তোমার ভাইবোন, বাপজান, আত্মীয়স্বজন যে তোমাকে এতটা ভালবাসে তা কি এমন ভাবে বুঝতে পারতে? এই অকৃত্রিম স্নেহ—দ্যাখো না কেন আমরা তিন ভাই তো তোমার বলতে গেলে হিন্দুস্তানের তিন প্রান্ত থেকে ছুটে এসেছি—এটা তো কোনদিন উপলব্ধিই করতে পারতে না।

আমাদের বাপজান বাদশা সালামৎ শাহানশাহ্ তোমাকে বেশী পিয়ার করেন তা জানতে—কিন্তু ঠিক এতটা যে করেন তা কি তুমিই কোন দিন ভেবেছিলে? এই জানাটাই তো জীবনের একটা বড় লাভ নয় কি?'

চোখ ছলছলিয়ে এল জাহান-আরার। তিনি গাঢ়-কণ্ঠে বললেন, 'ঠিকই বলেছ ভাই, ঈশ্বরের যে এত অনুগ্রহ আমার ওপর—তোমরা যে আমাকে এত ভালোবাসো সবাই—তা এই সাংঘাতিক বিপদ না ঘটলে বোধহয় এমন ক'রে বুঝতে পারতুম না।'

'তবেই ছাখো।' কণ্ঠেস্বরে কেমন যেন অস্বাভাবিক জোর দেন আওরঙ্গজেব, 'এই কথাই তো আমি বলি। কোন ঘটনাই এক দিক দিয়ে বিচার করতে নেই। যত খারাপ ঘটনাই ঘটুক না কেন, আমাদের মতো নির্বোধ গোলা লোকের দৃষ্টিতে তার মন্দ দিকটাই শুধু হয়ত চোখে পড়বে—কিন্তু বুদ্ধিমান, জ্ঞানবান লোকেরা কখনই শুধু একদিক দেখেন না, তাঁরা সমস্ত অসতের মধ্যে, মন্দের মধ্যেই করুণাময় খোদার কল্যাণ-হস্ত দেখতে পান। সেইখানেই যথার্থ জ্ঞান আর শিক্ষার পরিচয়। জ্ঞানী লোকেরা মনে রাখেন—যে ঈশ্বর রাত্রির অন্ধকার সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আবার দিনের আলো দিয়েছেন। রাতের আঁধিয়ার দেখে কেউ যদি সেইটেকেই ছুনিয়ার নিয়ম ভাবে তো সে তারই বেকুবি—নয় কি?'

এই বলে শাহ্জাদা আওরঙ্গজেব বিদায় নেবার ভূমিকা হিসেবেই বোধ হয় একেবারে উঠে দাঁড়ান।

জাহান-আরা মন দিয়ে শুনছিলেন কথাগুলো—আর এর গূঢ়ার্থটা ধরার চেষ্টা করছিলেন। তাঁর এই ভাইটি এত বাজে কথা বলার লোক নন, বিনা কারণে এত কথা বলছেন না। সেই কারণটা কি প্রাণপণে সেইটেই আন্দাজ করার চেষ্টা করছিলেন। এখন একেবারে ওঁকে উঠে দাঁড়াতে দেখে বেশ একটু অবাকই হয়ে গেলেন। কথা কি এইতেই শেষ হয়ে গেল?

'এখনই চললে ভাই সাহেব?'

'হ্যা উঠি এখন। তোমাকে বেশী বিরক্ত করা উচিত নয়। কথা কইতে তোমার এখনও রীতিমতো ক্লান্তি বোধ হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। এতক্ষণ ছিলুম—তাই হয়ত হাকিম সাহেবরা জানতে পারলে রাগ করবেন।'

তারপর চলে যেতে গিয়েও—যেন কী একটা মনে পড়ে যায় তাঁর, বলে ওঠেন, 'হ্যাঁ, ভাল কথা, শুনলাম তোমার এখানে নাকি খুব চুহার উপদ্রব হয়েছে। আমি একটা নূতন ধরনের চুহাকল পেয়েছি, বলো তো পাঠিয়ে দিই।'

জাহান-আরার বিস্ময়ের শেষ থাকে না, 'আমার এখানে চুহার উৎপাত হয়েছে—? কৈ, আমি তো শুনি নি। তোমাকে কে বললে একথা?'

'ঐ দ্যাখো, কে বললে তা কী আর মনে ক'রে রেখেছি! তবে নিশ্চয়ই কেউ বলেছে, নইলে আমি আর জানলুম কী ক'রে?·· যাক গে, কলটা তো আমার কাছে পড়েই আছে, পাঠিয়েই দিলাম না হয়। ক্ষতি কি? তবে তুমি একটু দেখো কলটা। একেবারে নতুন ধরনে তৈরী।'

এত লঘু প্রসঙ্গ এবং এই ধরনের ভাষা আওরঙ্গজেবের পক্ষে একেবারেই বেমানান। ব্যাপারটা কি, কী বলতে চান শাহ্‌জাদা? জাহান-আরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আসল কথাটা বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন। এখন একটু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, 'ইঁদুরকলের আবার নতুনত্ব! হাসালে তুমি ভাই সাহেব!'

'নতুনত্ব একটু আছে বলেই তো বলছি। বাজারে যা পাওয়া যায়, যা বাবুর্চিরা রসুই-ঘরে পাতে—এ তা নয়। আজব কল বানিয়েছে লোহার। তারে নয়—ইস্পাতে তৈরী কল, দরজাটাও ইস্পাতের, মজবুত আর ভারী কিন্তু অত ভারী দরজাও যখন বন্ধ হয়—একটুও আওয়াজ পাবে না। যে-গৃহস্থ পাতবে তার খোয়াব

দেখার এতটুকু ব্যাঘাত ঘটবে না। চুহারা ঠেলে বেরোবে সে উপায় তো নেই, ভেতরে তারা যতই কিচ্‌কিচ্‌ করুক, বাইরে তার এতটুকু শব্দ পৌঁছবে না। একটু হাওয়া বেরোবারই ফাঁক নেই, আওয়াজ বেরোবে কি ক'রে!'

'আচ্ছা—? তাই নাকি?' সাগ্রহে প্রশ্ন করেন জাহান-আরা। এতক্ষণে যেন কোথায় একটা আলো দেখতে পান তিনি।

'শুধু কি তাই?' আওরঙ্গজেব এত উৎসাহিত হ'য়ে ওঠেন, মনে হয় তিনিই বুঝি তৈরী করেছেন কলটা, যা-কিছু কৃতিত্ব তাঁরই, 'আরও আছে। এমনি বাজারের যা মামুলী কল, চুহাকে বার ক'রে মারতে হয়, অনেক সময় পালিয়ে যায়—কিন্তু এতে তার দরকারই হবে না। জলে ডোবালেই একপাশের একটা জায়গায় লোহা সরে যায় —মানে কলটা যদি বাড়ি ধরো তো – এক ধারের ছাদ দেবে যায়— সেখান দিয়ে জল ঢুকে চুহাকে চুবিয়ে মারে, অথচ সে পথেও চুহার পালাবার পথ থাকে না।'

কখন ধীরে ধীরে কঠিন ও গম্ভীর হ'য়ে উঠেছে জাহান-আরার মুখ, শাহ্‌জাদা হয়ত অত লক্ষ্য করেন নি। তাঁর বলা শেষ হ'লে জাহান-আরা অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন, তারপর ঈষৎ ক্লান্ত সুরে বললেন শুধু, 'আচ্ছা পাঠিয়ে দিও, দেখব।' আর কথাবার্তারও অবসর রইল না একেবারে চোখ বুজে ও-পাশ ফিরে শুলেন। সম্ভবত এতক্ষণ কথা বলার ক্লান্তিতে অবসন্ন বোধ করছেন।

শাহ্‌জাদাও আর বিরক্ত করলেন না, পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

প্রথমটা বাদশা অত বুঝতে পারেন না। রুগ্ন মেয়ের খেয়াল ভেবে কতকটা স্তোক দেবার ছলে বলেন, 'আচ্ছা সে হবে, হবে। একটা কেন বেটি, তোমার খুশি হ'লে শহর দিল্লী আর আগ্রা মিলিয়ে দশখানা বাড়ি বানিয়ে দেব। শাহ্জাহানাবাদ তৈরী হচ্ছে—নতুন শহরে তোমার বাড়িটাই সবচেয়ে মশহুর হবে—দেখে নিও।'

জাহান-আরা হাসেন, 'আপনি ভাবেন আমি এখনও আপনার সেই খুকী মেয়েটি আছি, না আলমপনা?'

'কেন, কেন, একথা কেন মা? আর আলমপনাই বা কেন, তোমাকে শুধু বাপজান বলে ডাকতে বলে দিয়েছি না!'

বাদশা যেন ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

'সে তো ডাকিই। আর তাই ডেকে ডেকেই বোধ হয় আপনিও ভুলে গেছেন যে, আপনি তামাম হিন্দুস্তানের বাদশা। কথাটা মধ্যে মধ্যে ইয়াদ করানো ভাল।'

'কেন?' ভ্রূ-কুঁচকে তাকান বাদশা, 'বলো না কী বাদশাহী দেখাতে হবে। কার কটা শির নামিয়ে আনতে হবে গর্দান থেকে—একবার বলেই ছাখো না।'

'ঐ জন্যেই তো বলছিলাম আপনি এখনও খুকী ভাবেন আমাকে। খামকা মানুষের শিরই বা কেটে আনতে বলব কেন?...কেন বাদশাহী জানাবার কি আর অন্য কোন তরীকা নেই।...

'বেশ তো, বলোই না কী হ'লে বাদশাহীটা তুমি বুঝতে পারবে।' সকৌতুকে মেয়ের দিকে চেয়ে হাসেন শাহানশাহ্।

'বলে কী করব বলুন। আপনার সে দিন আছে! একটা ছোট বাড়ি চাইলুম—তা আপনি দশটা বিশটা বাড়ি দেখিয়ে খুকী ভুলোচ্ছেন। একটাই দেবার সামর্থ্য নেই তো দশটা।'

'সামর্থ্য নেই!' যেন পৌরুষে ভীষণ আঘাত লেগেছে এমনি ভাব দেখান বাদশা, 'এত বড় কথা! বেশ বলো কী রকম বাড়ি চাও। আমার শাহ্‌জাহানাবাদের কিল্লা-ই-মুয়াল্লার* মতো একটা গোটা কিল্লা চাও? তুমি চাইলে তাও দিতে পারি!'

'আঃ, বাপজান, আপনার যত বয়স বাড়ছে আপনি যেন তত ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছেন। আমি কিল্লাও চাই না, গড়ও চাই না। চাই বড়ে ভাইয়া দারার মতো একটা ছোট্ট বাড়ি—দরিয়ার কিনারে। আপনি শুধু মেহেরবানী করে ইকতিদা খাঁকে একবার ডেকে পাঠান, তাহ'লেই হবে, বাকী যা করবার তা আমিই করব, আপনাকে ভাবতে হবে না।'

'তা ইকতিদা খাঁকেই বা কেন মা। তুমি বলো না ওর চেয়ে ঢের বড়ো আর ভাল সর্দার মিস্ত্রী আমার হাতে আছে, তাদেরই ডেকে পাঠাচ্ছি। দুনিয়ার সেরা মিস্ত্রী সব চুণে চুণে আনিয়েছি আমি —আমার মিস্ত্রীর ভাবনা! একটা বাড়ি করাতে কতক্ষণ লাগে।'

'না, বা'জান। ইকতিদা খাঁকেই আমার চাই।'

'তা বেশ তো, তাও হবে। তবে এখনই এত তাড়া কি। আর দু'দিন যাক না—'

'আপনি যদি কেবল ঐ ছেলেভুলোনোর মতো করেন বাবা, আমি কিন্তু আর আপনার সঙ্গে কথা কইব না, আপনাকে বা'জান বলেও ডাকব না আর।'

'এই দ্যাখো, রাগ করিস কেন বেটি, আমি তোর শরীরের কথা ভেবেই তো—। কী বিপদ! আচ্ছা, আমি এখনই ইকতিদা খাঁকে তলব ক'রে পাঠাচ্ছি। তা কি বলতে হবে?'

'না বা'জান, যা বলবার তা আমিই বলব। সে এলে এইখানে একটা পর্দা টাঙিয়ে দিতে বলবেন, পর্দার ভেতর থেকে আমি কথা

* লাল কিল্লার অনেকগুলি নাম ছিল, তার মধ্যে কিল্লা-ই-মুয়াল্লা অন্যতম।

কইব।...আপনাকেও কিন্তু হাজির থাকতে হবে, তাহ'লে আর ইকতিদা বেশী চালাকি করতে সাহস করবে না।'

'ইস! আমাকেই বুঝি দুনিয়ার সবচেয়ে হুঁশিয়ার লোক ভেবেছিস্? ওরে আমার মতো বুদ্ধু লোক কম আছে আমার মুলুকে। তা হোক—। যা বলছিস তাই হবে! কিন্তু ব্যাপারটা কি বল্ দেখি। আমার যেন কেমন গোলমাল ঠেকছে কোথায় একটা—'

'তা ঠেকুক না! যা বলছি সেই রকম হুকুম দিন তো! গোলমাল যদি কিছু থাকে, সে কি আর আপনার কাছে চাপা থাকবে! নিন, আপনি এখনই লোক পাঠান!'

ঠোঁট ফুলিয়ে আবদারের ভঙ্গীতে শেষের কথাগুলো বলেন জাহান-আরা।

বাদশার মনে হয় সেই মুহূর্তে তাঁর সামনে সেই ছেলেবেলার ছোট্ট খুকীটিকেই দেখলেন। বিস্তর জরুরী কাজ থাকা সত্ত্বেও ঠোঁট ফুলিয়ে এসে দাঁড়ালে, সব কাজ আর কাগজপত্র ফেলে যাকে কোলে তুলে নিতে হ'ত। আবদার ধরলে তাঁর এই মেয়েটিকে কোন দাই কি কোন বাঁদী ভোলাতে পারত না, একমাত্র বাদশা কোলে নিলেই শান্ত হ'ত।

তিনি তখনই ইকতিদা খাঁর কাছে লোক পাঠিয়ে দিলেন।

একে বাদশার সামনে ডাক পড়েছে, তায় পর্দার ওপাশে স্বয়ং জাহান-আরা শাহ্জাদী সাহেবা। ইকতিদা খাঁ তাঁর পায়ে যদি একটু কমজোরী অনুভব করেন তো বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। আর কপালে ঘাম দেখা দেওয়াও এমন বিচিত্র কি, যা পচা গরম!

তবে বেশীক্ষণ উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকতে হ'ল না। বাদশা অভয় দিয়ে বললেন, 'আমি নয় খাঁ সাহেব, বেটি-ই ডেকে পাঠিয়েছে। শাহ্জাদী সাহেবার শখ হয়েছে—বড়ে শাহ্জাদার মতো একটা বাড়ি করাবে। এখনও তো চোখে দেখে নি, লেকিন্

আমাদের মুখে শুনেই খেয়াল হয়েছে—ঠিক অমনি একটা বাড়ি চাই ওর। পারবে তো বানাতে, ছাখো ?'

শেষের দিকে ঈষৎ একটু চোখ টিপেই প্রশ্ন করেন শাহানশাহ্, তাঁর মুখ কৌতুকে উজ্জ্বল।

'বহুত শৌখ সে!' ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ে খাঁ সাহেবের। এনে কোতল করার জন্যে ডাকা হয় নি তাহ'লে, বরং আরও কিছু মোটা আয়ের পথই সুগম করার জন্যে ডেকে আনা হয়েছে।··· আসার আগে খাজা সাহেব সেলিম চিস্তির কবরে যে সিন্নি মেনেছিলেন পাঁচ সিক্কা টাকার—সেটা মনে মনে বাড়িয়ে পুরো এক মোহর ক'রে দিলেন ইকতিদা খাঁ সাহেব। বাবার অসীম দয়া—তা মানতেই হবে। ··মুখে বললেন, 'এর আর কথা কি, বলেন তো আজই শুরু ক'রে দিই, লোকজন সব তৈয়ার, হুকুম হ'লে এক মাহিনায় বানিয়ে দেব।' তারপরই যেন একটু উৎকণ্ঠার সুরে বললেন, 'লেকিন্ জাহাঁপনা জমিনটা ? সেটা একটু দেখে নেওয়া দরকার যে, নক্সা করার আগে।'

শাহানশাহ্ কোন জবাব দেবার আগেই পর্দার ওপার থেকে সুমধুর নারীকণ্ঠ ভেসে আসে, 'জমিন এখনও ঠিক হয় নি। তবে খোদার ফজলে আর শাহান্শার মেহেরবানীতে জমি পেতে দেরি হবে না। কিন্তু বাড়ি ঠিক ঐ রকম হবে তো ?'

'আলবৎ। পাশাপাশি একটা একটা ক'রে মিলিয়ে নেবেন, ঐ নক্সা মাফিক ক'রে দেবো—ঠিকঠিক। এক বুরুল এদিক ওদিক হবে না। তবে, ওর চেয়েও ভাল নক্সা আমার তৈরী আছে, যদি বলেন তো এমন বানিয়ে দেব যে, বড়ে শাহ্জাদার বাড়ি খারিজ হয়ে যাবে এর কাছে।'

'না, অত ভাল চাই না আমার। ঠিক ঐ রকমই চাই।···আচ্ছা ভাইয়ার নয়া বাড়ির তহ্খানরই নাম শুনছি সবচেয়ে—আমার বাড়িতেও অমনি হবে তো ?'

'জরুর। যদি ঠিক এক রকম না হয়, নিজের চোখ নিজে উপড়ে ফেলব আপনার সামনে।...ও নক্সা তো আমারই করা বড়ে বেগম সাহেবা। আর এও বলব, খাজা বাবার কুদরতে—এ মাথা থেকে যা বেরিয়েছে, তা আর কেউ ভাবতে পর্যন্ত পারত না। শওসাল কোসিস করলেও পারত না।'

'হ্যাঁ, শুনেছি খুব ভাল হয়েছে। কপাটটাই নাকি সবচেয়ে উমদা হয়েছে ওর মধ্যে। লোহার দরজা বলে বোঝাই যায় না নাকি, আর অত বড় কপাট, তবু এতটুকু আওয়াজ হয় না বন্ধ করার সময়। অথচ নাকি খুব ভারী—ভারী আর পুরু!'

'নাকি! দিওয়ার যতটা মোটা আছে অতটাই হবে দরওয়াজাটাও। পাক্কা পাঁচ মণ ওজন পাল্লাটার। অথচ একটা আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিন, বন্ধ হয়ে যাবে। কেউ টের পাবে না।'

'ঐ একটাই তো দরজা—না? গোটা মহলের।'

'জী। ইচ্ছে ক'রেই একটা করেছি। বেশী দরজা থাকলে বাইরের তাপ ঠেকানো যাবে না যে!'

'তা তো বটেই।...আচ্ছা, যদি কেউ হঠাৎ ভেতরে গিয়ে পড়ে, ধরুন অন্য লোক কেউ জানল না, চাবিও বাইরেই রয়ে গেল ধরুন—আর দরজাটা আপনিই বন্ধ হয়ে গেল—তাহ'লে সে বেরোবে কি ক'রে? ভেতর থেকে ডাকলে ওপরের লোক শুনতে পাবে? অত পুরু কপাট বলছেন—?'

'মুশকিল আছে শাহ্‌জাদী সাহেবা। ওপর থেকে কেন, বাইরে থেকেই শোনা যাবে না। পুরু লোহার দরজা, মানে গরম ঠেকানোর জন্যে তো করা হয়েছে—আওয়াজ বাইরে থেকে পাওয়া শক্ত।...তা এমনি তো লোকজন নোকর-বাঁদী থাকবেই—কতক্ষণ আর আটকা থাকবে বলুন, যখন কেউ খুলবে তখনই তো বেরিয়ে আসবে সে। দু'চার ঘণ্টা কেন, একদিন দু-দিনেও তো আর কেউ মরে যাবে না—'

'না, ধরুন শীতকালে তো আর কেউ তহ্‌খানায় যায় না, সে সময় যদি কোন ছোট ছেলেপুলে গিয়ে পড়ে ভেতরে, ভেতর থেকে খুলতে পারবে না তো?'

'চাবি না থাকলে পারবে না। কেউ শুনতেও পাবে না। তবে শীতকালে তো তহ্‌খানায় চাবি দেওয়াই থাকে। জাড়ার দিনে কে আর শখ ক'রে গিয়ে ঐ হিমঘরে ঢোকে বলুন।'

'তা ঠিক।···আচ্ছা, খাঁ সাহেব কাঠের চেয়ে তো লোহা তাড়াতাড়ি তাতে, তবে কাঠের না ক'রে লোহার কপাট বানালেন কেন?'

'তা বলতে পারবো না—ওটা শাহ্‌জাদার মর্জি। তবে সবটা তো ঢালাই লোহা নয়, তিন পুরু মোটা চাদরে তৈরী, প্রত্যেকটা লোহার শিকে আটকানো—প্রত্যেকটা থেকে প্রত্যেকটার মধ্যে খানিকটা ফাঁক আছে, তাই বাইরেটা তাতলেও ভেতরে সে তাত পৌঁছয় না খুব জলদি।'

খানিকটা চুপ ক'রে থাকেন শাহ্‌জাদী। তারপর বলেন, 'আচ্ছা শুনেছি তহ্‌খানা খানিকটা দরিয়ার মধ্যে পর্যন্ত গেছে—সেটা কি ঠিক?'

'জী, বেগমসাহেবা। সেইখানেই তো আমার এলেমদারী। হাজার হাজার মণ জল মাথার ওপর—তিন পাশে, তার মধ্যে ঘর করা—একি সহজ কথা! আর কারও হিম্মতে কুলোত না, আপনাদের এই বান্দা ছাড়া।'

'তা যদি কোন দিন কোন দেওয়াল ধ্বসে পড়ে, অতটা চাপ তো? যারা ভেতরে আছে—ঘুমিয়েই থাকবে আশা করা যায়—তাদের কি দশা হবে?'

'কোন দেওয়াল ভাঙবে না। চাই কি আপনি বাইরে থেকে কামান চালিয়ে দেখুন না। আপনারা ইচ্ছে না করলে এক ফোঁটা জলও ভেতরে ঢুকবে না।'

'ইচ্ছে করলে ঢুকতে পারে—না কি ? সে আবার কী রকম ?'

খুবই সহজ কণ্ঠে প্রশ্ন ক'রে যান শাহ্‌জাদী সাহেবা, অলস কৌতূহলের সুরে। বড়লোকেরা এই ধরনের কথা-বার্তাতেই অভ্যস্ত, ইকতিদা খাঁও তা জানেন, কোনই কাজ হবে না জেনে—কিছুই দরকার নেই, শুধু কথা বলার সুখে কথা বলে যাওয়া। তিনিও উৎসাহের সঙ্গে জবাব দেন, 'হ্যাঁ, সে ব্যবস্থা একটা আছে। নদীর দিকে, ছাদ ঘেঁষে একটা চোরা দরজা আছে। সেও অমনি ভারী লোহার দরজা, যা মালিক ইচ্ছে করলে বাইরে থেকে একটা চাকা ঘুরিয়ে খুলে দিতে পারেন আর তাহ'লে আধ ঘড়ির মধ্যে পুরো মহলটা জলে ভরে যাবে।'

'কেন, এ রকম করার মানে ?' এতক্ষণ চুপ ক'রে নীরব শ্রোতা হিসেবে বসে ছিলেন বাদশা, এখন অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন ক'রে ওঠেন, 'এর মানে কি ? এ তো রীতিমতো সব্বনেশে ব্যাপার।'

বাদশা বিষম উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন, তা বুঝতে দেরি হয় না শাহ্‌জাদীর। বাদশার কপালে বড় বড় ফোঁটায় ঘাম দেখা দিয়েছে, দুজন দাসী বড় বড় পাখায় হাওয়া করা সত্ত্বেও।

সে কণ্ঠস্বরে ইকতিদা খাঁ ভয় পেয়ে যান। উত্তর দিতে গিয়ে গলা কেঁপে যায় তাঁর, 'শোভানাল্লা! কথাটা—কথাটা আমার বলা উচিত হয় নি হয়ত। এ-সব গোপন তথ্য কাউকে না জানানোই ভাল। বড়ে শাহ্‌জাদা জানতে পারলে হয়ত কয়েদ করবেন আমাকে কিম্বা শূলে দেবেন। তাঁর বাড়ির কোথায় কি করিয়েছেন সেটা অপর কাউকে বলতে বার বার বারণ ক'রে দিয়েছেন।·· আমি, ভেবেছিলাম আলাহজরত যে আপনারা সব জানেন।···আমায়, আমায় মাফ করবেন আলমপনা, আমি আপনাদের কুত্তার কুত্তা, বড়ে শাহ্‌জাদা যা হুকুম করেছেন—'

'আপনার কোন ভয় নেই ইকতিদা খাঁ সাহেব, আপনি কিছু

অন্যায় করেন নি।' পর্দার ওপারের কণ্ঠ তেমনি মধুর, তেমনি অবিচলিত, তেমনি আশ্বাসভরা, 'শুধু এমন কেন করা হয়েছে—উদ্দেশ্যটা কি সেইটে বুঝতে পারছেন না বলেই শাহানশাহ্' বিস্ময় বোধ করছেন একটু!'

ইকতিদা খাঁ আশ্বস্ত হন কিছুটা। বলেন, 'মতলবটা বড়ে শাহ্জাদারই। তবে এমনি কথার কথা হিসেবেই একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ও-রকম কিছু হয় কি না। আমি তারপর আর কোন আলোচনা করি নি ওঁর সঙ্গে, একেবারে তৈরী ক'রে তাক লাগিয়ে দেব বলে। অবশ্য করেছি যে—কেমন হয়েছে তা কোন দিন পরখ ক'রে দেখাও হয় নি। শাহ্জাদাও বলেছিলেন তাই। এটা যে ঠিক ঠিক কাজ করবে তা বুঝব কি ক'রে? আমি বলেছিলুম, বলেন তো ক'রে দেখিয়ে দিই। তবে এই জল আবার বার ক'রে মহল সাফ করতে বিস্তর মেহনৎ করতে হবে আপনাকে। আর খোলা যতটা সহজ, বন্ধ করা তত সহজ হবে না। অতখানি জলের চাপ তো।'

'তা ওতে কি ফয়দাটা হবে, সেটা তো এখনও জানলুম না।'

পর্দার ওপার থেকে পুনশ্চ প্রশ্ন হয়।

'ফয়দা? এমনি কিছুই না। তবে যদি এমন কোন দুশমনকে কোন দিন হাতে পান, যাকে চুপি চুপি সরানো দরকার—তাকে তহ্খানায় বন্ধ ক'রে নিঃশব্দে ঐ চোরা দরওয়াজাটা খুলে দিলেই হবে। কেউ টেরও পাবে না। পেলেও, অনায়াসে বলা চলবে একদিকের দেওয়াল ভেঙে জল ভেতরে ঢুকেছে—'

'খুব ভাল। তবে আমার এত সব হাঙ্গামার দরকার নেই খাঁ সাহেব। এসব কায়দা বাদ দিয়ে মোটামুটি কতটা খরচ পড়তে পারে আমাকে একটা হিসেব দেবেন।'

'যে আজ্ঞে, নিশ্চয়ই দেব। সাত দিনের মধ্যেই আমি নক্সা আর হিসেব তৈরী ক'রে দিয়ে যাব।'

ইকতিদা খাঁ পর্দাকে একটা অভিবাদন জানিয়ে বাদশাকে কুর্ণিশ করতে করতে বেরিয়ে গেলেন।

পর্দা সরানো হ'লে দাসীদের ঘর থেকে চলে যেতে ইঙ্গিত ক'রে জাহান-আরা বাদশার মুখের দিকে চাইলেন।

বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে বাদশার মুখ। কপালে বড় বড় ঘামের ফোঁটা জমেছে। জেব থেকে রুমাল বার করার কথা মনে পড়ে নি, বোধ হয় আস্তিনেই ঘাম মুছেছেন বার কতক, আস্তিনটা ভিজে উঠেছে। মাটির দিকে চেয়ে পাথরের মতো স্থির হয়ে বসে আছেন শাহানশাহ্।

জাহান-আরার মনটা উদ্বেল হয়ে ওঠে ওঁর অবস্থা দেখে। আস্তে ডাকেন, 'বা'জান!'

যেন কান্নার মতো করুণ কণ্ঠে বলে ওঠেন বাদশা, তামাম হিন্দুস্তানের দণ্ড-মুণ্ডের মালিক শাহানশাহ্ শাহজাহান 'কিন্তু মা উপায় ছিল বলেই যে ইচ্ছাও ছিল—এটা তো প্রমাণ হয় নি।'

'প্রমাণ হ'লে আর এসব আলোচনার সময় পেতেন না, জাহাঁপনা।' জাহান-আরাও একটুখানি বিষণ্ণ হাসি হাসেন।

'না মা। অবিচার আমি করব না। এ আমি এখনও বিশ্বাস করি না। কেন করবে সে, কিসের অভাব তার? এ সবই তো তার হবে একদিন। তাই না?' একটু থেমে যেন সমর্থন খোঁজেন জাহান-আরার কাছে, উত্তর না পেয়ে আবারও বলেন, 'আর করলেই বা দোষ দেব কাকে? আমি কোন্ অধিকারে তার বিচার করব? আমি আমার বাবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি, তিনিও তাঁর বাবার জীবদ্দশাতেই সিংহাসন নিতে গিয়েছিলেন। এমন কি আকবরশাও, তাঁর পিতৃতুল্য মন্ত্রী, যিনি ঘোর দুর্দিনে বুকের রক্ত দিয়ে বালক বাদশার সিংহাসন রক্ষা করেছিলেন—তাঁকে এক কথায়, বিনা কারণে সরিয়ে মক্কা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বাবরশাহী রক্তের ধারাই

এই। যদি—যদিই এ-রকম একটা লোভ তার মনে এসে থাকে তো খুব একটা দোষ দিতে পারি না।···তুই, তুইও তাকে ক্ষমা কর মা। প্রমাণ তো কিছু পাস নি সঠিকমতো।'

'না, তা পাই নি। আর তা যখন পাই নি তখন ক্ষমার কথাই বা তুলছেন কেন বাবা।···কিন্তু আওরঙ্গজেবের ওপরই কি অবিচার করা ঠিক হচ্ছে?'

'না, না। তাও করব না। যদি সে জেনেই ও কাজ ক'রে থাকে তো তার ওটা অবাধ্যতা বলে গণ্য করা উচিত হবে না। বরং আমাদেরই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত তার কাছে।'

'জেনেই করেছেন বাবা, নইলে আমি জানলুম কী ক'রে?'

'ও, তুই জেনেছিলি, না মা! তাই ইকতিদাকে—।···আমি এবার বুড়ো হচ্ছি রে।' কেমন যেন খাপছাড়াভাবে হাসেন বাদশা, কান্নার থেকেও করুণ দেখায় সে হাসি। তার পর বলেন, 'তুই হুকুম দে মা, কী দিবি। আমি পাঞ্জা লাগিয়ে দেওয়াচ্ছি। না না, অবিচার কারুর ওপরই না হয়। বেচারা অকারণে কত লাঞ্ছনা সহ্য করল।·· টাকা,খেলাৎ, ঘোড়া—যা পাঠাতে চাস পাঠা। কৃপণতা করার দরকার নেই। দরবারে আসার অনুমতি-নামাও অমনি একটা লিখিয়ে দিস্। আরও জানিয়ে দে যে, তার মনসবদারী সুবাদারী সব তাকে আবার ফিরিয়ে দেওয়া হ'ল। যা কিছু করতে হয় তুই-ই কর মা, তোকেই খোদা বাদশাহী করার মতো বুদ্ধি বিবেচনা সবচেয়ে বেশী দিয়েছেন, আমার সব ছেলেমেয়ের মধ্যে।'

'আচ্ছা, আচ্ছা। হয়েছে। আপনি চুপ করুন তো বা'জান। সক্কালবেলাই বসে বসে মেয়ের গুণগান করতে হবে না।'

সস্নেহে ধমক দিয়ে ওঠেন জাহান-আরা।

॥ ৮ ॥

ইকতিদা খাঁ বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে কাঁপতে শাহ্‌জাদা দারার খাস দপ্তরে এসে দাঁড়ালেন। তলব এমনই জরুরী, ভাষা এমনই কঠিন যে, খাজা বাবার নাম ক'রে বেরিয়েও স্বস্তি পান নি। এখানে এসেও যা দেখলেন তাতেও আশ্বস্ত হবার মতো এতটুকু ভরসা খুঁজে পেলেন না। বজ্রগর্ভ মেঘের মতো অন্ধকার মুখে একা বসে আছেন বড়ে শাহ্‌জাদা, তাঁর স্বভাবসুন্দর প্রশান্ত মুখ যেন ভয়ঙ্কর একটা চাপা ক্রোধে বিকৃত, দৃষ্টি কঠিন ও জিঘাংসু। সেদিকে চেয়ে ইকতিদা খাঁর মনে হ'ল একটা কোন জাবিত প্রাণীকে বাঘের মতো নিজের নখে খণ্ডবিখণ্ড ক'রে ফেলতে না পারলে এ উষ্মার শান্তি ঘটবে না তাঁর।

ইকতিদা আসতেই, কোন কুশল প্রশ্ন বা কোনরকম ভূমিকা না ক'রেই প্রশ্ন করলেন শাহ্‌জাদা দারা, 'তুমি কাল আমার ভগ্নী শাহ্‌জাদী সাহেবার কাছে গিয়েছিলে?'

গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল ইকতিদা খাঁর। কোনরকমে শুধু ঘাড় নাড়লেন।

'কেন? আমার নামে চুকলি খেতে?'

'না জনাব-ই-আলী। এ আপনি কি হুকুম করছেন। খোদা জানেন, আমি নিজে যাই নি। খোদ বাদশা-সলামৎ লোক পাঠিয়ে আমাকে তলব করেছিলেন। বহুত ইসাদী আছে হুজুর। জিজ্ঞাসা করলেই তারা বলবে।'

'কিন্তু তুমি সেখানে আমার কথা কি বলেছ তাই শুনি!'

হিংস্র কণ্ঠে প্রশ্ন করেন শাহ্‌জাদা।

কণ্ঠস্বর যতই শাণিত আর তীক্ষ্ণ হোক, গলা চড়াতে সাহস করছিলেন না শাহ্‌জাদা। তাতেই একটু ভরসা পেলেন ইকতিদা। বললেন, 'আমাকে কিছুই বলতে হয় নি জনাব-ই-মবারক, শাহ্‌জাদী

সাহেবা নিজেই আপনার বাড়ির কথা তুললেন। ঠিক ঐ রকম একটা বাড়ি তাঁকে ক'রে দিতে হবে। ঐ রকম দরিয়ার কিনারে! ···কিন্তু সেটা তত কাজের কথা বলে মনে হ'ল না, বাড়ির অন্য কথা ছেড়ে ঘুরে-ফিরে কেবল তহ্‌খানার কথাই জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন বারবার।'

'তহ্‌খানার কী কথা?' প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও শাহ্‌জাদার গলা যেন কাঁপা কাঁপা আর বিকৃত শোনাল।

'তিনি সবই জানেন দেখলাম' ও পক্ষের ভয় দেখে ইকতিদা খাঁ আরও একটু ভরসা পেয়েছেন, 'আসলে কথাগুলো একবার শাহানশার সামনে ঝালিয়ে নিলেন বই আর কিছু নয়।···দরজাটা কত পুরু, আর কত ভারী—একবার বন্ধ হয়ে গেলে ভেতর থেকে ধাক্কাধাক্কি, হাজার ডাকাডাকি করলেও বাইরে থেকে শোনা যায় কিনা—এই সব। দেখলাম তিনি চোরা দরওয়াজাটার কথাও জানেন। ওটা কেন করা হয়েছে, সেইটেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন বারবার।···শাহানশাহ্ সুদ্ধ—'

'তুমি কি বললে!' যেন আর্তনাদের মতো শোনাল শাহ্‌জাদার গলাটা, 'আমি যে ওর বিন্দুবিসর্গও জানতুম না, সেটা বলেছ তাঁদের?'

'নিশ্চয়ই বলেছি।' অর্ধসত্য বলার সময় কণ্ঠস্বরে যতটা জোর দিতে হয় ততটাই দেন ইকতিদা, 'বলেছি বৈকি সে কথা। বলেছি যে শাহ্‌জাদাকে একেবারে তাক লাগিয়ে দেব বলে ঘুণাক্ষরেও জানাই নি তাঁকে।'

কেমন একরকম অসহায় আর করুণ কণ্ঠে বলেন শাহ্‌জাদা, 'আমি—আমি তো সত্যিই কিছুই জানতুম না ইকতিদা, তুমিই তো এটা করলে।'

'আমি তো বলেছি শাহ্‌জাদীকে—বিশ্বাস করুন। স্বয়ং শাহানশাহ তো সেখানে বসেছিলেন—'

'তিনি শুনে কি বললেন?'

'তিনি একটা কথাও বলেন নি। চুপ ক'রে শুনেই গেলেন। আর এতে বলবারই বা কি আছে?'

দারা আর কিছু না বলে অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়ান একবার, আবার ধপ্ ক'রে বসে পড়েন।

'কেন জনাব-ই-আলী, শাহানশাহ্ কি কিছু বলেছেন আপনাকে? কোন সোবে করেছেন?'

'না না, সোবে করবেন কেন? সোবে আবার কিসের? এ-সব কি বলছ ইকতিদা খাঁ, তোমার আস্পর্ধা তো কম না!'

অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন শাহ্জাদা দারা।

সন্দেহ কেউ করেছেন কিনা, করলেও ঠিক কতটা করেছেন—সেইটেই যে বুঝতে পারছেন না তিনি। কিছুই বুঝতে পারছেন না। তাঁকে কেউই ডেকে পাঠায় নি, কোন কৈফিয়ৎও চায় নি। কাল বিকালবেলা যখন জাহান-আরাকে দেখতে যান তখনও কিছু জানতে পারেন নি। সন্ধ্যার পর কিল্লায় গিয়ে যখন শুনলেন বাদশার তবিয়ৎ ভাল নেই, তিনি শুতে গেছেন, তখনও অত কিছু ভাবেন নি। এমন আজকাল প্রায়ই হয়, শাহানশার এমন মাথা ধরে বিকেলের দিকে যে—একেবারে মাথা তুলতে পারেন না। সুতরাং এ বিপদের আভাসমাত্র পান নি কোথাও। একেবারে বাড়িতে ফিরে শুনেছেন কথাটা। শোনাবার জন্যেই বিবর্ণ পাংশুমুখে তাঁর নিজস্ব পার্ষদের দল বসে অপেক্ষা করছিল। শুনলেন বাদশা নাকি তু-তিন উট বোঝাই দিয়ে শাহ্জাদা আওরঙ্গজেবকে ভেট পাঠিয়েছেন, টাকা মোহর খিলাৎ রেশমী কাপড়ের থান—দামী সাজসুদ্ধ দশটা ঘোড়া আর সেই সঙ্গে মনসবদারী যে তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হ'ল তার হুকুমনামা এবং দরবারে হাজির হবার আমন্ত্রণ পত্র। প্রত্যেক-টিতেই বাদশার নিজের দস্তখৎ আর পাঞ্জার ছাপ। ফলে আজ তৃতীয় শাহ্জাদার বাড়িতে আমোদের হুল্লোড় পড়ে গেছে; গোটা বাড়িটা আলো দিয়ে ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে, দরগায় দরগায়

সিন্নি চড়ানো হচ্ছে, ফকিরদের ডেকে দুহাত বোঝাই ক'রে ফল আর মিষ্টি দেওয়া হচ্ছে। খোদ শাহ্‌জাদা ছুটেছেন নিজামউদ্দীনে নিজে হাতে ফুল আর আগরবাতি চড়াতে পীরসাহেবের কবরে।···

আর, এই প্রসঙ্গে ঐ পার্ষদেরই একজনের মুখে শুনেছিলেন, কাল সকালে ভগ্নী জাহান-আরার ওখানে ইকতিদা খাঁর ডাক পড়ার কথা। তারপর অবশ্য দুই আর দুইয়ে চার মিলিয়ে পেতে দেরি হয় নি। চুকলি খেয়েছে কেউ, নিশ্চয়ই চুকলি খেয়েছে। আর এক্ষেত্রে যে চুকলি খাওয়া যায়, যে অভিযোগ আনা যায়-- সে যে সাংঘাতিক। তার ফলাফল ভাবতে গেলেই হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে যে!

কাল সারারাত দু চোখের পাতা এক করতে পারেন নি বড়ে শাহ্‌জাদা। এক টুকরো কোন খাদ্যও মুখে তুলতে পারেন নি। চরম সর্বনাশের মুখে দাঁড়িয়ে কার আর পানভোজনে রুচি থাকে! এখনও কেউ অভিযোগ আনে নি, এখনও ডাক পড়ে নি বাদশার কাছে—কিন্তু পড়লে যে আর কিছু বলবার নেই, কী ক'রে প্রমাণ করবেন যে, তাঁর কোন অসদুদ্দেশ্য ছিল না। তার চেয়েও বিপদ এই নীরবতা, এইটেই যে অস্থির ক'রে তুলেছে তাঁকে—এই অনিশ্চয়তা। অথচ নিজে থেকে কিছু গিয়ে অনুক্ত অনুচ্চারিত অভিযোগের জবাব দেওয়া যায় না। সে তো অপরাধ স্বীকারেরই সামিল।

এই সবই ভেবেছেন কাল সারারাত, সারারাত পায়চারি করেছেন একা একা। শুধু যখন খুব পিপাসা বোধ করেছেন, বুক অবধি শুকিয়ে উঠেছে, তখন একটু ক'রে দ্রাক্ষারসজাত সুরা পান করেছেন। তাতে শরীর এবং মস্তিষ্ক দুই-ই অধিকতর উত্তপ্ত হয়েছে শুধু, চিন্তার কোন সুসার হয় নি, তন্দ্রাও নামে নি চোখে।···

মনটা বহুদূর চলে গিয়েছিল। খেয়াল হ'ল ইকতিদা খাঁ এখনও দাঁড়িয়ে আছে চোখের সামনে এবং সম্ভবত তাঁর দুশ্চিন্তাটা

অনুমান ক'রে নিয়ে মনে মনে উপভোগ করছে। সঙ্গে সঙ্গে সর্বাঙ্গে যেন বিষ ছড়িয়ে দিল কে। এ লোকটাকে এখনই নিজে হাতে কেটে ফেলতে পারলে, নিদেন পক্ষে কয়েদ করতে পারলেও কতকটা শান্তি হ'ত তাঁর—কিন্তু তাতে তাঁর ওপর সন্দেহটা বেড়েই যাবে সকলের, সেই ভেবেই কিছু করতে পারছেন না।

অতিকষ্টে সে জিঘাংসা দমন ক'রে রূঢ় কণ্ঠে শুধু বললেন, 'আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পারো। তবে শহরের বাইরে যেও না কোথাও—আমাকে না জানিয়ে ; বাড়িতে নজরবন্দীর মতো থাকবে। যদি আমার কোন বিপদ হয় তোমার ঐ বাড়ি করার জন্যে, তা হ'লে তোমাকেও আমি ছেড়ে দেব না!'

ইকতিদা খাঁ অকারণেই সেলাম করেন একটা কিন্তু যাওয়ার কোন লক্ষ্মণ দেখান না। বরং বারকতক হাত কচলে কাতর স্বরে বলেন, 'একটা কথা বলব বান্দা-নওয়াজ ?'

'কি ?' তেমনি রূঢ় কণ্ঠে বলেন বড়ে শাহ্‌জাদা, 'তোমার আবার কী বলার আছে ?'

'আপনার এই বাড়ি থেকে কেউ চুকলি খেয়েছে ?'

'চুকলি খাবার লোকের অভাব নেই ইকতিদা খাঁ, তা আমি জানি, আমার সর্বনাশ হয়ে যদি ছুটো টাকাও বেশী মুনাফা হয় তাহ'লে তুমিই কি চুকলি খেতে পিছ-পা হবে ?'

'আমি তো আছিই বড়ে শাহ্‌জাদা, আমার মতো লোককে পায়ে টিপে মারতে তো বেশী সময় লাগবে না! কিন্তু আমার কথাটা একেবারে ঠেলবেন না, দয়া ক'রে একটু শুনুন। কাল-রাত্রেই আমি খবরটা পেয়েছি। করিমবক্স লোহার—যার কারখানায় আমি ইস্পাত-লোহার কাজ-টাজ করাই—তার মুখে শুনলাম আপনার হারেমের এক বাঁদী তার কোন মিস্ত্রীকে দিয়ে একটি চুহাকল তৈরী করিয়েছে।'

'বেশ তো, তাতে কি ?'

'বলছি খুদাওয়ান্দ—সবটা শুনুন দয়া ক'রে। সে চুহাকল নাকি বাজারের সাধারণ চুহাকল নয়। ছোট্ট কল কিন্তু ফরমাশ হয়েছিল কলটা আগাগোড়া ইস্পাতের চাদরে তৈরী করতে হবে, তার দিয়ে নয়। দরওয়াজাও হবে লোহারই, আর দরওয়াজাও একটা হবে না, ওপর দিকে একটা বাড়তি দরজা থাকবে, চাবি ঘুরিয়ে খুলতে হবে সেটা, আর ভেতর দিকেই খুলবে শুধু। বেশ পরিষ্কার ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যেমন বলা হচ্ছে তেমনিই চাই। মিস্ত্রীও গরজ বুঝে এক আশরফি হেঁকেছিল। তাতেই রাজী হয়ে তৈরী করানো হয়েছে। এই আজব ফরমায়েশ বলেই মিস্ত্রী গল্প করেছে করিমবক্সের কাছে, তার কাছ থেকে আমি শুনলুম।'

তবুও বুঝতে পারেন না দারা, শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন ইকতিদার মুখের দিকে। সুরাপানের মাত্রা বুঝি বেশীই হয়ে গেছে —মনে মনে ভাবেন বড়ে শাহ্‌জাদা।

আরও একটু ইতস্ততঃ ক'রে মাথা চুলকে ইকতিদা বলেন, 'গুস্তাকী মাফ করতে হুকুম হয় গরীব-পরোয়র—আমাকে নিজের জান বাঁচানোর জন্যেই এত খোঁজ খবর করতে হয়েছে।—আমার বাবুর্চির ফুফেরা বহিন হ'ল মহামান্যা বড়ে শাহ্‌জাদীর বাঁদী। আমি বাবুর্চিকে পাঠিয়ে কালরাত্রেই খবর নিয়েছি—শাহ্‌জাদা মানে আপনার ভাই যখন পরশু গিয়েছিলেন তাঁর বহিনজীকে দেখতে, তখন এমনি একটা চুহাকলের কথা গল্প ক'রে এসেছিলেন, শাহ্‌জাদীকে পাঠিয়ে দেবেন বলেছিলেন দেখবার জন্যে। তাই শুনতে শুনতেই নাকি শাহ্‌জাদীর মুখ গম্ভীর হয়ে যায়, শাহানশাকে বলে আমাকে ডাকতে পাঠান।'

'তা সে বাঁদী জানল কি ক'রে?' প্রশ্নটা কি শাহ্‌জাদাই করছেন? তিনি নিজের গলা যেন নিজেই চিনতে পারেন না। যেন খুব দূর থেকে ক্ষীণস্বরে আর কে কথা কইছে।

'আজ্ঞে, ও বাঁদী, মানে আমার বাবুর্চির ফুফেরা বহিন, ও আড়াল

থেকে নাকি শুনেছিল সব। কোন মন্দ মতলব ছিল না জনাব-ই-আলী শাহ্‌জাদারা ভাইবোনে কেমনভাবে কথা বলেন তাই শোনবার জন্যেই নাকি দাঁড়িয়ে ছিল।···আমাকে বিশ্বাস ক'রে বলেছে খুদাওয়ান্দ, কথাটা জানাজানি হ'লে কিন্তু ওদের কারও শির থাকবে না!' শেষের কথাগুলো খুব মিনতির সঙ্গেই বলেন ইকতিদা।

দারা হাসেন এবার। তাঁর বিবর্ণ মুখে হাসিটা হাসির উপহাস বলেই মনে হয়। তিনি বার দুই রুমালটা খোঁজবার বৃথা চেষ্টা ক'রে টুপিটা খুলেই কপালের ঘাম মোছেন, তারপর সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেন, 'শির শেষ পর্যন্ত কার থাকে আর যায় তাই ছ্যাখো ইকতিদা খাঁ। হয়ত তোমার আমার কারুরই থাকবে না। কিন্তু ওদের শির ঠিক ওদের গর্দানে থেকে যাবে, আর এমনি ক'রে মনিবের নিমক খেয়ে তার দোরে আড়ি পাতবে—আরও বহুদিন। তা তুমি তো বিস্তর খবর রাখো দেখছি, একদিনে যোগাড়ও করছে ঢের, বাদশা শাহ্‌জাদাদের গুপ্তচর আছে, খবব যোগাড় করার জন্যে তন্‌খা-করা লোকও আছে—কিন্তু বানিয়া ব্যবসাদারদের ওসব না থেকেও দেখি তারা আমাদের থেকে ঢের বেশী ওয়াকিবহাল। তা আমার হারেমের সে জেনানাটি কে—সে খবরটা দিতে পারো?'

'আমাদের খবর যে প্রাণের দায়ে যোগাড় করতে হয় আলিজা, যে তন্‌খার জন্যে খবর আনে সে আমাদের সঙ্গে পেরে উঠবে কেন! তিস্‌রে শাহ্‌জাদার বাড়ি খিলাৎ আর মোহর পৌঁছবার খবর কি আর আমিই পাই নি। তারপর থেকে সারারাত ছুটোছুটি করেছি এইসব খোঁজ নিতে। যে বাঁদী গিয়েছিল তার নাম বলে নি। তবে এদেশের মেয়ে নয় সে, বয়স হয়েছে তার, মদ্দাটে গোছের চেহারা, কথায় কথায় চটে যায়। মিস্ত্রীর সোবে হয় সে কেরেস্তান, অন্ততঃ কেরেস্তান ছিল কোনকালে। ওর সঙ্গে গল্প করতে করতে দুটো কাঠি জোড়া ক'রে কেরেস্তানদের দোকাঠির মতো

ক'রে মাথায় ঠেকিয়েছিল একবার! এর বেশী আর বলতে পারে নি সে।'

'আচ্ছা তুমি যাও।' বলেন কিন্তু ইকতিদা খাঁ চলে গেল কিনা তাও আর লক্ষ্য করেন না শাহ্‌জাদা দারা, ফরাসের ওপর তাকিয়াটায় ঠেস দিয়ে মূর্ছিতের মতো এলিয়ে পড়েন।

॥ ৯ ॥

এ সন্দেহ যে শাহ্‌জাদা দারার সর্বনাশেরও বেশী। এ জানার আগে যদি শাহানশার হুকুমে তাঁর শির যেত তাহলেও বোধ হয় এত কষ্ট হ'ত না। সত্যি সত্যিই বুকে যেন একটা দৈহিক আঘাত পেয়েছেন—এমনি একটা যন্ত্রণা অনুভব করেন।

তহ্‌খানার ঐ ওপরের দরজাটার কথা ইকতিদা ও মিস্ত্রীরা ছাড়া আর দুটি মাত্র প্রাণী জানে—তাঁর দুই বেগম। একেবারে জ্যেষ্ঠা ও সর্বকনিষ্ঠা। যাকে বাঁদী থেকে বেগম করেছেন তিনি।

সব চেয়ে যেটা দুঃসহ বোধ হচ্ছে—এ সন্দেহটা যে এইমাত্র, ইকতিদার এ কথায় হয়েছে তা নয়—তার আগেও মনে এসেছে তাঁর—শুধু, এতক্ষণ পর্যন্ত কিছুতেই সে সংশয়কে প্রশ্রয় দেন নি, জোর ক'রে যেন দু-হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছেন।

খোঁজ খবর তিনিও কিছু কিছু নিয়েছেন বৈকি।

বুলন্দশহর থেকে ফিরে যখন শুনেছেন যে শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজেবের এক বেগম অন্তঃসত্ত্বা হয়েছেন বলে তিনি তাঁর জায়েদের কাছে বিভিন্ন ভেট পাঠিয়েছেন—তখনই তাঁর মনে নানারকম কুটিল সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। অনেক সম্ভব অসম্ভব শয়তানীর কথা ভেবেছেন তখনই—ঠিক কোনটাকে ধরা-ছোঁওয়ার আওতায় পান নি। কিন্তু যার চাকরি গেছে, মাসোহারা বন্ধ

হয়েছে, দরবারে যার প্রবেশ নিষিদ্ধ—তার স্ত্রী এত তুচ্ছ কারণে উপঢৌকন বিলোবে এটাও বিশ্বাস করা কঠিন, অন্ততঃ দারার পক্ষে। আর কেউ না চিনুক তিনি বিলক্ষণ চেনেন তাঁর এই তৃতীয় ভ্রাতাকে। অত্যন্ত ধূর্ত এবং অত্যন্ত হিসাবী। বহুদূর পর্যন্ত না ভেবে কোন কাজ করে না সে। তাছাড়া মিতব্যয়ী—কৃপণ বলাই উচিত। বিনা স্বার্থে বা প্রয়োজনে অকারণ টাকা খরচ করা তার পক্ষে একেবারেই স্বভাববিরুদ্ধ। মতলব একটা নিশ্চয়ই আছে, শুধু সেইটে কি—ভেবে পাচ্ছিলেন না।

কিন্তু ভাবছিলেন ক্রমাগতই। এ রহস্যের মূল আবিষ্কার না করা পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। এটা ঠিক যে আওরঙ্গজেবকে কিছু একটা করতেই হবে, এবং করতে হবে দ্রুত। কোণঠাসা জন্তুর মতো অবস্থা তার, সে যদি আক্রমণ ক'রে বেরিয়ে আসতে না পারে তো মৃত্যু অবধারিত। আর পড়ে মার খাবার লোক সে নয়। সেই আক্রমণটা কোন্ দিক দিয়ে আসবে, এই উপহার বিতরণটাই সে আক্রমণের সূচনা বা অংশ কি না এই দুর্ভাবনায় ঘুম হচ্ছিল না তাঁর। অবশেষে কাল, নিজের আসন্ন সর্বনাশের তীরে দাঁড়িয়ে, নিচের অতলস্পর্শী অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কোথায় যেন একটু আলো দেখতে পেয়েছিলেন তিনি। আক্রমণ নয়—প্রস্তুতিই হবে নিশ্চয়। আসলে ভেট দিতে আসার নাম ক'রে খবর সংগ্রহ করাই উদ্দেশ্য ছিল। খবর নেওয়া কিম্বা দেওয়া—কে জানে! হয়ত কোন অশুভ যোগাযোগ আছে এবাড়িতে কোথাও। কিন্তু সে যোগসূত্রটা কি? কে? এ খবর নেওয়া বা দেওয়ার লক্ষ্য যে তিনিই—সে বিষয়ে দারার সন্দেহ মাত্র ছিল না, অপর ভাইদের বাড়ি ভেট পাঠানো হ'ল আসল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য গোপন করা, মনোযোগটা ঘুরিয়ে দেওয়া। ওটা ছদ্ম আবরণ মাত্র।

যত ভেবেছেন ততই এই সম্ভাবনাটা বেশী বিশ্বাস্য বলে মনে হয়েছে। আর ততই মাথা গরম হয়ে গেছে, সন্দেহের পীড়নে অস্থির

হয়ে উঠেছেন। শেষে গভীর রাত্রেই জাবেদ আলিকে ডাকিয়ে পাঠিয়েছেন। এই ঘরে নিভৃতে জেরা করেছেন তাকে। একে একে নিজে সূত্র যুগিয়ে সে দিনের সন্ধ্যার ঘটনা তাকে মনে করতে বাধ্য করিয়েছেন।

নবাব বাঈয়ের বাঁদী যখন মহলে মহলে ঘোরে সে সঙ্গে ছিল কি না? প্রথমটা জাবেদ নিশ্চিন্ত হয়ে জানিয়েছিল যে সে তো ছিলই, অন্য এক পরিচারিকাও ছিল মুসম্মৎ বলে। আরও কেউ কেউ ছিল। সমস্ত সময়ই সঙ্গে ছিল তারা। কিন্তু অত সহজে দারা নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন নি।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এবং ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জেরা করতেই আসল তথ্যটা প্রকাশ পেয়েছিল। সব ঘরেই ওরা সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছিল কেবল কাশ্মীরী বাঈয়ের ঘর ছাড়া। অতটা দরকার বোঝে নি আর। তখন আর একটিই মাত্র ডালা বাকী, কী আছে ডালায় তাও দেখা হয়ে গেছে—তাই আর অত গরজ ছিল না কারও। জাবেদ আলিরও কোন সন্দেহ হয় নি বাঁদীর ব্যবহার দেখে। সে নিজে বেগমসাহেবার দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে চলে গিয়েছিল, বাঁদী কোন কথাই বলে নি। তাছাড়া বেগমসাহেবার খাস বাঁদী জহিরণ ছিল, সে-ই নিয়ে গেছে ভেতরে। আর—দারার রক্তবর্ণ চোখের দিকে চেয়ে তাড়াতাড়ি যোগ করে জাবেদ আলি, 'সে বাঁদী বেশীক্ষণ ছিলও না, অর্ধদণ্ডকালও বোধ করি হবে না, তার মধ্যেই বেরিয়ে এসেছে মহল থেকে।…'

রাগ হবারই কথা, অসহ্য ক্রোধই বোধ করেছিলেন বড়ে শাহ্‌জাদা, কিন্তু তখন আর এ নিয়ে চেঁচামেচি করার শক্তি বা রুচি কোনটাই ছিল না। বুড়ো হয়ে গেছে জাবেদ আলি এই সংসারে, তাঁকেও এতটুকু বয়স থেকে দেখছে—তাকে আর এখন কর্তব্যের ওপর বক্তৃতা দেওয়া যায় না, তিরস্কার তো করাই যায় না। শুধু একটু তিক্ত হাসি হেসে বলেছিলেন, 'আধ দণ্ড সময় বড় কম নয় জাবেদ আলি, তারও ঢের কম সময়ে এক গোছা খৎ পৌঁছে দেওয়া যায়,

আরও এক গোছা নিয়ে যাওয়া যায়। শুনেছি পানিপথের লড়াইয়ে হিমু যদি আর আধ দণ্ড টিকে থাকতে পারতেন তাহলে বৈরাম খাঁকে আর জিততে হ'ত না, মুঘলদের শাহী তখৎ নিয়ে এসব বখেরা কিছুই হ'ত না। তোমার তো এইখানেই জীবন কাটল জাবেদ আলি, মাটিতে যাওয়ার সময় হ'তে চলল প্রায়, তোমার এ ভুল করা উচিত হয় নি।'

'কিন্তু কাশ্মীরীবাঈ বেগমসাহেবা বলেই—'তিরস্কৃত জাবেদ প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে কী বলতে গিয়েছিল, দারা মাঝ পথেই থামিয়ে দিয়েছিলেন, 'আচ্ছা তুমি এখন যাও' বলে বিদায়ও ক'রে দিয়েছিলেন তাকে।

থামিয়ে দিয়েছিলেন তার কারণ কথাটা তাঁর একটা গোপন অথচ গভীর ক্ষতের জায়গাতেই আঘাত করেছিল।

কাশ্মীরী বাঈ বেগম সকল সন্দেহের উর্ধ্বে এটা তিনিও শুনতে চান, বিশ্বাস করতে চান। কাশ্মীরী বাঈ তাঁর নবতমা, সেজন্য একটু বেশী মোহ থাকবে তাঁর—এটা স্বাভাবিক। কাশ্মীরী বাঈয়ের অসাধারণ রূপ, অল্প বয়স—এগুলোও সে স্বাভাবিক কারণের অনুসঙ্গী। কিন্তু আজ কদিন ধরেই একটা আকারহীন সন্দেহ—ঠিক সন্দেহ বললেও ভুল বলা হবে হয়ত—একটা সামান্য তথ্য কাঁটার মতো খচ খচ করছে। এই কদিন আগেরই ঘটনা। এক চিত্রকর তাঁদের কয় ভাই, বাদশা, তাঁর পিতা জাহাঙ্গীর শাহ্ ও পিতামহ আকবর শার ছবি এঁকে এনেছিল—উদ্দেশ্য বিক্রী করবে। জাবেদ আলি তাকে বাইরে বসিয়ে ছবিগুলো এনেছিল শাহ্‌জাদাকে দেখাতে। দারা তখন কাশ্মীরী বাঈয়ের মহলে ছিলেন, দুজনে এক সঙ্গেই দেখেছিলেন ছবিগুলো, খুব যে একটা পছন্দ হয়েছিল তা নয় —তবু আশা ক'রে তাঁর কাছে এসেছে, কিছু কেনা কর্তব্যবোধেই তিনি পিতা ও পিতামহের দুখানি পট কিনেছিলেন। তারপর এমনি অলসভাবে প্রশ্ন করেছিলেন, 'তুমি কিছু রাখতে চাও ছবি, এর মধ্যে

থেকে ?' কিছু ভেবে বলেন নি, তবু মনে হয়েছিল যে কাশ্মীরী বাঈ হয়ত তাঁর ছবিখানা রাখতে চাইবে। কিন্তু বেগম ঠোঁট উল্টে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গী ক'রে বলেছিলেন, 'এ কিচ্ছু আঁকতে জানে না, একটা ছবিও আসল চেহারার কাছ দিয়ে যায় নি।'

'কেন, আমার ছবি আমার চেহারার সঙ্গে মিলছে না?' রহস্যচ্ছলে বলেছিলেন শাহ্জাদা, 'আমার চেহারা কি এর চেয়েও খারাপ?'

'না ঢের ভাল। আপনার চেহারার কিছুই আনতে পারে নি।' বেশ একটু উত্তেজিত ভাবেই বলেছিলেন বেগমসাহেবা, 'বিশেষ ক'রে এই তিসরে শাহ্জাদার ছবিটাই দেখুন না, এই কি তাঁর ছবি হয়েছে! তাঁর অমন সুন্দর চেহারার কিছুই আসে নি এতে!'

'তুমি আবার তিসরে শাহ্জাদাকে দেখলে কোথায়? এত ভাল ক'রে?' সামান্য ঈর্ষা বোধ করেছিলেন কি না তা আর মনে পড়ে না, তবে কৌতূহলটাই প্রবল হয়েছিল তখন।

'বাঃ, তা দেখবো না কেন! পথে ঘাটে দরবারে। এই তো সেদিনও এখানে এসেছিলেন।'

'তা বটে। তবে আমার সেজ ভাইয়ের চেহারা এত খুবসুরৎ একথা তোমার আগে আর কারও মুখে শুনি নি। আমাদের বংশে সকলেই অবশ্য মোটামুটি ভাল দেখতে—তবে আমাদের চার ভাইয়ের মধ্যে সবাই বলে আমার আর শাহ্জাদা মুরাদের চেহারাই বেশী সুন্দর!'

'ছোটে শাহ্জাদা। বলবেন না, কুস্তিগীর পালোয়ানের মতো এতখানি লম্বা চওড়া হলেই কি আর সুন্দর হয়। যে পুরুষের মুখে বুদ্ধির ছাপ নেই, যার চোখে গভীরতা নেই, সে আবার সুন্দর কি?'

জাবেদ আলি ছবিগুলোর তাগাদা করতে প্রসঙ্গটা সেইখানেই চাপা পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু আজ, সেই প্রায়-ভুলে-যাওয়া অলস

কথোপকথনের ইতিহাসটা, বুকের মধ্যকার ক্ষতটায় নতুন জ্বালার সৃষ্টি করল।

ইকতিদা খাঁ বিদায় নেবার পর বহুক্ষণ ঐ ভাবে মূর্ছিতের মতো পড়ে রইলেন শাহ্জাদা। ঘুমিয়ে আছেন কি মূর্ছা গিয়েছেন তা বোঝা কঠিন, এমনই স্থিরভাবে চোখ বুজে শুয়েছিলেন। ওঁর খাবাস গোসল করার জন্য জল তৈরী ক'রে ডাকতে এসে ফিরে গেল দুবার।

শেষে প্রায় চার দণ্ড এইভাবে পড়ে থাকার পর উঠে বসলেন আবার। কিন্তু তখনই স্নান করতে গেলেন না, আরও এক চুমুক সুরা পান ক'রে জাবেদ আলিকেই ডেকে পাঠালেন আবার।…

জাবেদ এসে দাঁড়াতে তিনিই কাছে এগিয়ে গেলেন। খুব নিম্ন কণ্ঠে প্রায় চুপি চুপি প্রশ্ন করলেন, 'জাবেদ, আতাউল্লা শহরে আছে কি না—জানো?'

'কোন্ আতাউল্লা জনাব?'

'যে বাঁদী বিক্রী করে?'

'ও, কাশ্মীরীবাঈকে যার কাছ থেকে কিনেছিলেন? হ্যাঁ, সে এই তো কদিন হ'ল এসেছে।'

চাবুকের মতো মুখের ওপর এসে আঘাত করল কথাটা। মুহূর্তের জন্য চোখ বুজে মুখটা বিকৃত ক'রে যেন সত্যিকারের একটা দৈহিক আঘাত সামলে নিলেন শাহ্জাদা। কিন্তু তার পর যখন কথা কইলেন তখন কণ্ঠস্বরে সে আঘাতের চিহ্নও পাওয়া গেল না। সহজ ভাবেই প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি ক'রে জানলে সে এসেছে?'

'ওর বোন গওহর বিবি যে দুবেলা হাঁটাহাঁটি করছে—কিছু বাঁদী বেচে দিতে পারি কি না আমরা, কিম্বা আমরাই কিনব কি না এই খোঁজে। খুব নাকি ভাল মাল এনেছে, নাচ গান জানা, দেখতেও খুবসুরৎ, তার দাম উঠছে না।'

দারা একটুখানি ইতস্তত করলেন, তারপর বললেন, 'আজ সন্ধ্যেবেলা একবার তাকে ডেকে আনতে হবে জাবেদ আলি। লোক পাঠিয়ে নয়, তুমি নিজে গিয়ে নিয়ে আসবে। কেউ না টের পায়, খুব সাবধান। নৌকোয় আনবে, দরিয়ার দিক দিয়ে—একেবারে তহ্‌খানায় নিয়ে যাবে। আমি সেখানে থাকব, একাই থাকব। তুমি বাইরে থেকে পাহারা দেবে, কেউ না কোন কারণে গিয়ে পড়ে।... প্রাসাদের কোন লোক—তুমি ছাড়া টের পেলে চলবে না।'

জাবেদ আলি নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ল। বুঝেছে সে। এ ধরণের কাজ আজ নতুন নয় তার। এমন বহু রহস্যই তার মাথায় জমা আছে, তার সঙ্গে মাটিতে চলে যাবে।

দারাও যেন এতক্ষণে কিছুটা নিশ্চিন্ত হলেন। সংশয় ঘুচল বলে নয়—মনটা স্থির করতে পেরেছেন বলে, রহস্য সমাধানের ঠিক রাস্তা খুঁজে পেয়েছেন বলে।

সেই দিনই গভীর রাত্রে আবার জাবেদ আলির ডাক পড়ল, শাহ্‌জাদা দারার খাস কামরায়।

উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘরে পায়চারি করছেন দারা শুকোহ্‌। মাথায় কোন আচ্ছাদন নেই, চুলগুলো এলোমেলো উশ্‌কো খুশ্‌কো। দেখে মনে হয় নিজে হাতে টেনে ছেঁড়বার চেষ্টা করেছেন নিজের চুল। মুখখানা এক দুঃসহ ক্রোধে বিকৃত—ওষ্ঠপ্রান্তে বাবরশাহী বংশের বৈশিষ্ট্য—নিষ্ঠুর বঙ্কিমতা, এটা দারার মুখে এর আগে কখনও দেখা যায় নি—স্বভাব-প্রশান্ত আর প্রসন্ন মুখ তাঁর। চোখ দুটো কোটরগত, রক্তবর্ণ। দৃষ্টিতে পৈশাচিক জিঘাংসা। দারার এ চেহারা একেবারেই নূতন।

দেখে মনে হয়েছিল এখনই যেন ফেটে পড়বেন শাহ্‌জাদা।

কিন্তু কথা কইলেন যখন, তখন তাঁর অস্বাভাবিক শান্ত কণ্ঠস্বরেই বরং চমকে উঠল জাবেদ আলি।

সে ঘরে ঢোকা মাত্র পায়চারি থামিয়ে ওর সামনে এসে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাশ্মীরী বাঈয়ের বাঁদী জহিরণ রাত্রে অন্য তাতারী বাঁদীদের সঙ্গে পাহারা দেয় ?'

'দেয় আলিজা। কিন্তু সে মহলের মধ্যে, বাইরে ওর ভাই পাহারা দেয়। সপ্তাহে দুদিন তার পালা।'

'হুঁ, ওকে কিছু বলবার দরকার নেই ; তাতারী বাঁদী আর হাবসী খোজাদের মধ্যে যে কজন তোমার খুব বিশ্বাসী, মানে যাদের বিশ্বস্ততার প্রমাণ পেয়েছ এর আগে—মনে রেখো যা বলছি তা যদি পাঁচ কান হয় তাহলে বুড়ো কি পুরনো লোক বলে রেয়াৎ করব না, তাদের সঙ্গে তোমাকেও জ্যান্ত পুঁতে ফেলব আমি—তুমি আর তারা পালা ক'রে দিনরাত কাশ্মীরী বাঈয়ের মহলে নজর রাখবে, সামনে দাঁড়িয়ে পাহারা নয়, শুধুই লক্ষ্য রাখবে। কে ঢুকছে কে বেরোচ্ছে—ঘড়ি ঘড়ি খবর চাই আমার। কোন বাইরের লোক এলে, যে কোন ছুতোতেই আসুক—তখনই আমাকে খবর দেবে। আর সেই সঙ্গে জহিরণের ভাই আর জহিরণকেও চোখে চোখে রাখবে সর্বদা। কিছু বলবে না, কোন কাজে বাধা দেবে না, চোখে চোখে যে আছে তাও জানতে না পারে। রাত্রে পাহারা দিতেও নিষেধ করবে না। শুধু লক্ষ্য রাখবে, এই পর্যন্ত। যদি গ্যাখো কোন বাইরের লোক কাউকে নিয়ে আসছে তাও বাধা দিও না, এমন কি যদি বেগম সাহেবার ঘরে নিয়ে যায় তাহ'লেও না। শুধু আমাকে তৎক্ষণাৎ খবর দেবে। আজ থেকে আমি এই ঘরেই থাকব, রাত্রেও শোব। দরকার বুঝলেই দিনে হোক রাতে হোক আমাকে খবর দেবে।···বুঝেছ ? ঠিক ঠিক ইয়াদ থাকে যেন।'

জাবেদ আলি ঘাড় নেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, দারা ইশারায় দাঁড় করালেন।

'আর শোন, ফিরিঙ্গীদের কাছ থেকে সেই যে তিনটে কুকুর কেনা হয়েছিল—সেগুলো বেঁচে আছে এখনও ?'

'আছে বৈকি। ভালই আছে।

'ওদের নৌকরকে বলো—আজ থেকে যেন ওদের আধপেটার বেশি খেতে না দেয়। খুব রোগা হয়ে যাচ্ছে দেখলে আমাকে জানাবে, তখন আবার খাবার বাড়িয়ে দেব।'

॥ ১০ ॥

শাহ্জাদা আওরঙ্গজেব তাঁর চিঠিপত্রের মধ্যে এমনই ডুবে ছিলেন যে, দেলওয়ার বহুক্ষণ থেকে এসে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে তা জেনেও মুখ তুলে তাকাবার ফুরসুৎ পান নি। অবশ্য খুব প্রয়োজনও বোধ করেন নি। এমন প্রায়ই এসে দাঁড়িয়ে থাকে সে, যদি মালিক তাঁর ব্যক্তিগত সেবার কোন ফরমাশ করেন এই আশায়। একমাত্র দেলওয়ারেরই এ ঘরে বিনা এত্তেলায় বিনা আওয়াজে আসবার অধিকার আছে। শাহ্জাদার খাবাসেরও তা নেই। তাকেও এ ঘরে ঢোকবার আগে ঈষৎ শব্দ ক'রে ঢুকতে হয়। শাহ্জাদার এই রকমই নির্দেশ।

অনেকক্ষণ পরে হাতের চিঠিটা শেষ ক'রে মুখ তুলে তাকালেন আওরঙ্গজেব। আর সঙ্গে সঙ্গে ওর দাঁড়ানোর ভঙ্গী দেখেই বুঝলেন যে, এখন তাঁর হুকুমের আশায় আসে নি, ওরই কোন আর্জি আছে। একটু হেসে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'কী রে, কি চাই ?'

একটু ঢোঁক গিলে বার-দুই মাথা চুলকে দেলওয়ার বলল, 'আজ মঙ্গলবার আলিজা, আজ যাব একবার ? অনেকদিন হয়ে গেল, তিনি আমার আশায় আছেন।'

গম্ভীর হয়ে গেলেন আওরঙ্গজেব। বললেন, 'তোকে তো একবার বলে দিয়েছি দেলওয়ার যে এখন ও চেষ্টা করিস নি। এক কথা বার বার বলা আমার নিয়ম নয়। যাকে তা বলতে হয়—তাকে আমি কাছে রাখি না। দুশমনকে খোঁচা দেওয়া হয়েছে, তাকে আহত

ক'রে আমরা অক্ষত দেহে থেকে গিয়েছি—এতে তার মরীয়া হবারই কথা। কি করেছে না করেছে তা জানি না। কতটা কি খবর পেয়েছে তাও বুঝছি না। আমি যতদূর খবর পেয়েছি, এমনি যেমন চলছিল তেমনি চলছে। সেইটেই খারাপ লাগছে আমার। এই ক'দিনে বড়ে শাহ্‌জাদার নাকি এমন চেহারা হয়েছে যে চেনা যাচ্ছে না। শাহানশাহ্ তাঁকে কিছুই বলেন নি, সম্ভবত ভগ্নী জাহান-আরাও না, হয়ত তাঁরা ঠিক বিশ্বাসও করেন নি—কিন্তু কিছু বলছেন না বলেই দারার আরও মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, এ অবস্থা আমি জানি, আমারই ভাই–তার মনের অবস্থা বেশ বুঝতে পারছি। ল্যাজে পা দেওয়া সাপের মতোই ফনা তুলে বসে আছে। সুযোগ পেলেই ছোবল মারবে।'

শেষের কথাগুলো কতকটা আপন মনেই বললেন, স্বগতোক্তির মতো।

'কিন্তু আমি যে খোদার নাম ক'রে, আপনার নাম ক'রে জবান দিয়ে এসেছি তাঁকে!'

'বেশ তো, আয়ু তো তোমার ফুরিয়ে যায় নি। জবান পুরো করার জন্যে সারা জিন্দিগীই তো পড়ে আছে। খোদা কিছু আমাদের মতো বেওয়াকিফ নন, তিনি সবই দেখছেন। যদিই ঘটনাচক্রে ওয়াদা পুরো করতে না পারো তাও তিনি মাফ করবেন। তিনি চেষ্টাটাই দেখেন, মনের ইচ্ছা তাঁর কাছে গোপন থাকে না।'

হঠাৎ যেন দেলওয়ারের ত্বচোখে জল ভরে আসে। সে ওঁর পালঙ্কের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বলে, 'বেগম সাহেবা আপনাকে তাঁর জীবনের চেয়েও ভালবাসেন খুদাওয়ান্দ্, আপনার খবরের জন্য মরে যাচ্ছেন তিনি।'

'সেটা তাঁর অন্যায়।' বেশ একটু কঠিন কণ্ঠেই বলেন শাহ্‌জাদা, 'তিনি এখন আমার আত্মীয়া, গুরুজন। আমার জন্যে তাঁর এত চিন্তা করা উচিত নয়।'

বলতে বলতেই বোধ হয় মনে পড়ে যায় সে বেগম সাহেবা তাঁর কথা এত চিন্তা না করলে তাঁর বা তাদের অবস্থা কি হ'ত। তাই সঙ্গে সঙ্গেই সামলে নিয়ে ঈষৎ কোমল কণ্ঠে আবার বলেন, 'বেশ তো, এতকাল যদি আমার খবর না পেয়ে কেটে থাকে তাঁর—আরও দু-চার মাস বেশ কাটবে।...তুই এখন যা এখান থেকে, পালা। আমার হাতে অনেক জরুরী কাজ আছে।'

অগত্যা দেলওয়ারকে অভিবাদন করতে করতে বেরিয়ে আসতে হয়। কিন্তু সারাদিনই মন-মরা হয়ে থাকে সে। তিন সপ্তাহ কেটে গেছে, হয়ত আরও কয়েকদিন বেশিই হবে, জবান্ রাখতে পারে নি।... শাহ্‌জাদা এত বোঝেন, কাশ্মীরীবাঈ বেগম সাহেবার কষ্টটা যে কেন বোঝেন না। বিশেষ যিনি ওঁর জন্য এত করলেন!

বেগম সাহেবার সেই আশ্চর্য সুন্দর চোখ দুটিতে কী করুণ অশ্রুই না দেখেছে সে! তার মতো সামান্য গোলামের হাত ধরে তিনি অনুনয় করেছেন শুধু একটুখানি খবরের জন্য। সে এতই হতভাগ্য আর অপদার্থ যে আজ পর্যন্ত সেটুকুও দিতে পারল না। অথচ খোদার নামে শপথ ক'রে এসেছে সে, মালিকের নামেও—যাঁকে এ দুনিয়ায় খোদার পরই মান্য করে, ভালবাসে আরও বেশী।

সেইটেই যে ভুলতে পারছে না কিছুতে। ভুলতে পারছে না সেই দুটি সজল চোখের মিনতি।...

সেদিন সন্ধ্যার সময়ই দপ্তরের কাজ শেষ ক'রে শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজেব বড় বেগম সাহেবার মহলে চলে গেলেন। শোনা গেল রাতের খানাও সেইখানেই যাবে। তার মানে ওঁর ব্যক্তিগত ভৃত্যদের সে রাত্রির মতো ছুটি, সেই সঙ্গে দেলওয়ারেরও।

দেলওয়ার এটাকে যেন ঈশ্বরেরই ইঙ্গিত মনে করল। আসলে তার মন এই ধরনের একটা ইঙ্গিত খুঁজে বেড়িয়েছে সারাদিন—একটা কোন প্রশ্রয় ওর গোপন সঙ্কল্পের। সারাদিন মনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে

সে, এখন এমনিই প্রায় হার মেনে বসেছিল, এইটেই খোদার নির্দেশ মনে ক'রে শান্তি পেল।

বৃথা ভয় পাচ্ছেন শাহ্‌জাদা। কাম ফতে ক'রে এসে সে তাঁকে তাক লাগিয়ে দেবে। রাগ করবেন অবাধ্যতার জন্যে? তা হয়ত করবেন, তবে এমন কিছু শাস্তি দেবেন না। আসলে তিনিও এটা মনে মনে চান, তিনি কি আর কাশ্মীরীবাঈ বেগম সাহেবার ব্যথা বুঝছেন না? শুধু তার বিপদের কথা ভেবেই নিরস্ত করতে চাইছেন। কিন্তু কি আর বিপদ হবে? জহিরণ তো থাকবে বলেছে, যদি না থাকে সে তো ফিরেই আসবে।··

দূরে কিল্লার ঘড়িতে এগারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়ল সে।

তার টাট্টু ঘোড়াটা সে আগেই বাইরে বেঁধে রেখে এসেছিল।

এটা শাহ্‌জাদার উপহার তাকে, এবারের এই সফল দৌত্যের বকশিশ। কেউ কিছু বললও না তাকে অসময়ে বাইরে যাবার জন্যে, সকলেই জানে সে বয়সে বালক হ'লেও শাহ্‌জাদার প্রিয় এবং বিশ্বস্ত সেবক, নানা রকম সম্ভব অসম্ভব কাজে তাকে যখন তখন পাঠান তিনি। কোন কৈফিয়ৎ চাইতে যাওয়াও ঠিক নয়।

রাস্তায় পড়ে দেলওয়ার খানিকটা কদম চালে নিয়ে গেল ঘোড়াটাকে। তারপর, শাহ্‌জাদার সম্ভাব্য শ্রুতিসীমার বাইরে আসতে পেরেছে সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। শাহ্‌জাদা নিশ্চয়ই এতক্ষণ শুয়ে পড়েছেন, বড়ে বেগম সাহেবার মহলও দূরে—তবু শাহ্‌জাদার চোখ এবং কান যে কতদূর যায়—আজও যেন তার হিসাব পেল না দেলওয়ার।

বড়ে শাহ্‌জাদার বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরেই আবার ঘোড়ার গতি কমিয়ে দিল সে। একেবারে কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া যাবেও না, খানিকটা পায়ে হেঁটেই যেতে হবে। রাত্রে বাড়িতে পাহারা থাকে, ঘোড়ার পায়ের শব্দ পেলে সকলেই সতর্ক হয়ে যাবে।

জায়গাটা আগেই একদিন দেখে গিয়েছিল সে—দিনের বেলায়। খানিকটা পোড়ো জমির মতো খালি পড়ে আছে, তাতে নিচু নিচু কাঁটা গাছ কতকগুলো—ঠেঁটি আর বেত-ঝোপ, কিছু শিয়াকুল—আর কিছু নেই। সে মাঠ পেরিয়ে গেলে নিচু খানার মতো পড়ে কতকটা—তারপর শাহ্‌জাদার বাড়ির পাঁচিল। দেওদার ও চেনারে যেখানে জড়াজড়ি, সেখানটাও চিহ্নিত করা আছে। রাত্রেও ভুল হবে না। সে মাঠেরও এপারে একটা গাছে ঘোড়াটাকে বেঁধে সাবধানে এগিয়ে চলল। ইচ্ছে ক'রেই গাঢ় সবুজ রঙের পোশাক পরে এসেছে, রাত্রে না দূর থেকে কারও নজরে পড়ে। পায়ে খুব নরম চামড়ার জুতো, তবু সেটা নিচে খুলে রেখে খালি পায়েই পাঁচিলে উঠল।

পাঁচিলে উঠে কিছুক্ষণ স্থির হ'য়ে বসে রইল সে। কোথাও কোন শব্দ আসে কি না কোন দিক থেকে, কান খাড়া ক'রে শুনে নিল, অন্ধকারে চোখ অভ্যস্ত হয়ে গেছে এতক্ষণে—বেশ ক'রে চেয়েও দেখল চারিদিকে। না, মানুষ তো দূরের কথা, কোথাও কোন জীবিত প্রাণীর চিহ্ন নেই। অন্তত সেখানটায়।

অনেকক্ষণ দেখে, কিল্লার ঘড়িতে বারোটা বাজা শুরু হ'তেই সেই শব্দের সুযোগে টুপ ক'রে ভেতরে নেমে পড়ল সে।

যেখানে নামল তার পাঁচ-সাত হাত তফাতেই আম গাছটা; তার ছায়ায় গুঁড়ির সঙ্গে গা মিশিয়ে নিশ্চল দাঁড়িয়ে ছিল জহিরণ, এবার নিঃশব্দ ক্ষিপ্রগতিতে কাছে এসে চাপা গলায় প্রশ্ন করল, 'কে, কে তুমি?'

'আমি দেলওয়ার হোসেন। তুমি তো জহিরণ বিবি?' তেমনি ভাবেই প্রায় অস্ফুট স্বরে উত্তর দিল সে।

জহিরণ আর কথা কইল না। শুধু ওর কাঁধটা ধরে সঙ্গে আসবার ইঙ্গিত জানাল। কোথায় কোথায় শুকনো পাতা আছে জহিরণ জানে, অথবা নিজেই আগে এসে সরিয়ে দিয়ে গেছে সে—শব্দ হওয়ার সম্ভাবনা বাঁচিয়ে গাছের ছায়ায় ছায়ায় গা ঢাকা দিয়ে এগিয়ে

চলল ওরা ; হাত পায়ের পর্যন্ত কোন শব্দ না ক'রে। জহিরণের সঙ্গে কোন হাতিয়ার নেই আজ, বাইরে যেতে হবে না, হাতিয়ারের দরকার নেই। মিছিমিছি আওয়াজ হওয়ার ভয় থাকে তাতে।

দীর্ঘপথ পেরিয়ে দালানের পেছনের দরজাটার সামনে এল ওরা। এইখানে এসে জহিরণ থমকে দাঁড়াল একবার। দেলওয়ার কিছু শোনে নি, কিন্তু জহিরণের মনে হ'ল কী যেন একটা সামান্য শব্দ পেল সে, যেন তাদেরই মতো পা টিপে টিপে কেউ আসছে। রাত্রে পাহারা দেয় জহিরণ, এতটুকু আওয়াজ ধরে নিতে অভ্যস্ত তার কান। সে নিঃশ্বাস রোধ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল—আর একবার সেই শব্দ পায় কি না। কিন্তু সব নিস্তব্ধ, দূরে বড় ফটকের দিকে সান্ত্রীরা পায়চারী করছে, আর কোন প্রাণলক্ষণ নেই কোথাও। তারই মনের ভয় বা ভ্রম—মনে ক'রে জহিরণ নিশ্চিন্ত হ'ল। দালানের দরজা ভেজানোই ছিল, কব্জায় নিজে তেল দিয়ে রেখেছে সে, খুলে ভিতরে ঢুকে গেল। ভেতরের একমাত্র তেলের আলোর তখন প্রায় নিবন্ত অবস্থা, সম্ভবত তেল নেই। হয়ত জহিরণই কোন সময় খানিকটা তেল কমিয়ে দিয়ে গেছে।...

দালান পেরিয়ে ওপরের দালান পেরিয়ে নির্বিঘ্নে কাশ্মীরী-বাঈয়ের ঘরে পৌঁছল ওরা। বেগম সাহেবা জেগেই বসেছিলেন, সেই ভেট আসার পর থেকে—প্রতি দোসুম্বা ও সেসুম্বা অর্থাৎ মঙ্গল ও বৃহস্পতিবারে জেগেই থাকেন তিনি, এক ঘড়ি না বাজা পর্যন্ত। বসে থাকেন দেলওয়ারের আশায়, মন উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করে, যদিচ তাঁর সহজাত বুদ্ধি বলে যে আসার প্রয়োজন নেই, অনর্থক বহুলোকের বিপদ টেনে আনা। কদিন শাহ্‌জাদা দারা তাঁর ঘরে আসছেন না, কারও ঘরেই যাচ্ছেন না অবশ্য, নিজের দপ্তরঘরে বাস করছেন—কিন্তু তাঁর যা চেহারা হয়েছে, জহিরণের মুখে যা শুনেছেন—একদিন আড়াল থেকে নিজেও এক লহমা দেখেছিলেন—তাতে ভয়ই হয়েছে তাঁর, খুবই ভয় হয়েছে। হয়ত উনি কিছু জেনেছেন

কিম্বা সন্দেহ করেছেন। ঠিক কতটা জেনেছেন বা সন্দেহ করেছেন তা না জানা পর্যন্ত বেগমসাহেবা স্বস্তি পাচ্ছেন না মনে।

দেলওয়ারকে দেখে ছুটে এসে আজও ওর হাত দুটো ধরলেন। এমনি একটি ছোট ভাই ছিল তাঁর, আজ সেও, যদি বেঁচে থাকে, এত-বড়টিই হয়েছে—এমনই সুন্দর। কে জানে ভাগ্য তাকে কোথায় নিয়ে ফেলেছে, সেও এমনি কোথাও দাসত্ব করছে কি না কে জানে!

কিন্তু সময় নেই মোটে। কাজটা যে ভাল হয় নি, বড় বেশী দুঃসাহসিক হয়েছে তা বেগমসাহেবা জানেন। যতক্ষণ বা যতদিন আসে নি, আশাটা আর আকুতিটাই প্রবল ছিল, এখন শুধুই আশঙ্কা। বেগমসাহেবা কোন বৃথা ভূমিকা করেন না, চাপা এবং দ্রুত কণ্ঠে বলেন, শাহ্‌জাদা, 'শাহ্‌জাদা কেমন আছেন? রাজী-খুশী আছেন তো? তিনিই কি তোমাকে পাঠালেন, না তুমি নিজেই এলে? জানিয়ে এসেছ তো? আমাকে কি কিছু বলে পাঠিয়েছেন? আমাকে, আমাকে এখনও ইয়াদ আছে তাঁর?'

ওঁর ব্যাকুলতা দেখে আজও দেলওয়ারের চোখে জল এসে পড়ে। সে মনে মনে ভগবানের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে মিথ্যে বলে, 'হ্যাঁ, তিনিই তো পাঠালেন। আপনাকে জানাতে বলেছেন যে আপনি যা করলেন—সে ঋণ তিনি কখনও ভুলবেন না। যদি খোদা দিন দেন তো তিনিও দেখিয়ে দেবেন যে তিনি বেইমান নন। আপনাকে তিনি কোনদিনই ভোলেন নি—এই কথাটা জানাতে বলে দিয়েছেন বার বার।'

'এইটুকুই আমার যথেষ্ট পুরস্কার। ভগবান যিশু তোমার মঙ্গল করুন ভাই. কিন্তু তুমি এবার যাও। আর এসো না এখন। মালিকের ভাবভঙ্গী ভাল লাগছে না। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আমার বুক কাঁপছে। আমার অদৃষ্টে যা আছে হবে, যদি বেঁচে থাকি তো তাঁর খবর পাবই। তাঁর জয় হবে, তাঁর উন্নতি হবে। তাঁকে বলো যে আমি জানি তিনিই মুঘলদের শাহী তখ্‌তে

একদিন বসবেন। তাঁকে রুখতে পারে এমন কেউ নেই। তাঁর সিকি যোগ্যতাও নেই এদের। বলো যে তাঁর সুখেই আমার সুখ, তাঁর উন্নতিতেই আমার আনন্দ। যেখানেই থাকি আমার মন পড়ে থাকবে তাঁর পায়েই। তুমি এখন যাও ভাই, যদি দিন পাই, সেদিন তোমার যোগ্য পুরস্কার দেব, এখন সামান্য টাকা মোহর দিয়ে তোমার অপমান করব না।'

দেলওয়ার আরও কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু কান্নায় গলা বুজে আসায় বলতে পারল না। এ কান্না কিসের তা সে জানে না, আপাততঃ কোন দুঃখই নেই বেগম সাহেবার—শুধু তাঁর এই আবেগই ওর মনের সূক্ষ্ম ও কোমল আবেগের তারে আঘাত করেছে, সেই আঘাতের ব্যথায় সে তার কাঁপছে রিণ্‌রিণ্‌ করে।

বলবার সময়ও পেল না অবশ্য। অসহিষ্ণু জহিরণ ওকে প্রায় টেনেই বাইরে নিয়ে এল। সময় নেই আর। এখনও কিছু বিপদ ঘটে নি কিন্তু তারও ভাল লাগছে না এ-বাড়ির কদিনের আবহাওয়া। জাবেদ আলি মাঝে মাঝে তার দিকে বিচিত্র দৃষ্টিতে চায়। যেন তাকে হুঁশিয়ার ক'রে দিতে চায়। তার অজ্ঞাত কোন বিপদের দিকে সঙ্কেত করতে চায়। কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারে না। জহিরণও সাহস ক'রে না প্রশ্ন করতে। কদিন ধরেই তার মনে হচ্ছে অনেকগুলো সতর্ক চোখ সর্বদা একটা অদৃশ্য দৃষ্টির জাল পেতে রেখেছে তার চার দিকে।

আবার সেই ওপরের দালান পেরিয়ে সিঁড়ি। সিঁড়ি থেকে নিচের দালান। এবার সেখানকার সামান্য আলোটুকুও আর নেই। তা না থাক, এ পথের নাড়ী-নক্ষত্র জহিরণের জানা, সে দেলওয়ারের একটা বাহুমূল ধরে অভ্রান্ত পদক্ষেপে বাইরে নিয়ে এল।

একেবারে বাইরে পা দিয়ে দেলওয়ার যেন আশ্বস্ত হয় একটু। হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। নক্ষত্রের আলো নেই, আকাশ মেঘে ঢাকা—তবু ভেতরের থেকে এখানে নজর চলে কিছু। কিন্তু জহিরণ অতটা

নিশ্চিন্ত হ'তে পারল না। আবারও যেন কী আওয়াজ পেল সে। খুব দূরে—খুব চাপা একটা শব্দ। তবু এবার আর নিজেরই ভয়ের প্রতিধ্বনি বলে মনে হ'ল না। মনে হওয়ার কোন কারণ নেই। বাগানে প্রহরী থাকে—কিন্তু তার মধ্যে ওর ভাইও আছে। তাকে বলাই আছে, বেগম সাহেবা অনেক মোহর দিয়ে বশ করেছেন তাকে—সে বাকী ত্বজনকে বাগানের বড় ফটকের দিকে টেনে নিয়ে যাবে এই সময়টায়—এদিকটায় ফাঁকা রাখবে।

শব্দটা কেমন যেন অনৈসর্গিক, যে সব শব্দ শুনতে অভ্যস্ত সে—সে রকম নয়। ধাতব শব্দ একটা। খুবই চাপা, খুব সাবধানে কোন জিনিস নাড়তে গিয়ে দৈবাৎ যেমন এক-আধটু শব্দ হয়ে যায় তেমনিই। কিন্তু কিসের শব্দ, কে করছে ?

জহিরণ দেলওয়ারের কানের মধ্যে মুখ দিয়ে বলে, 'জলদি জলদি, আর এক লহমাও দেরি নয়, শিগ্‌গির চলো, যতটা পারো শিগ্‌গির।'

প্রায় টানতে টানতেই নিয়ে যায়। সোজাসুজি ছুটতে ভরসা হয় না। দৌড়লে খালি পায়েরও আওয়াজ উঠবে।···

প্রায় পাঁচিলের কাছাকাছি গিয়ে পড়েছে। আমগাছটা থেকে মাত্র হাত কতক দূরে।

ত্বজনেই শুনল এবার।

এবার আর ভুল হওয়ার কোন কারণ নেই। এ শব্দ ত্বজনেরই পরিচিত। কোন জন্তুর নরম পায়ের আওয়াজ। এই দিকেই দৌড়ে আসছে।

এক নয়—একাধিক। ভারী বড় জন্তু।

জহিরণ প্রাণপণে দৌড়তে লাগল এবার।

দেলওয়ারের হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল। আর শব্দের ভয় করলে চলবে না। এবার সে মরীয়া। এই কহাত ব্যবধান যদি পার হ'তে পারে—কোনমতে বাচ্চাটাকে পাঁচিলে তুলে দিতে পারে, তাহ'লেই নিশ্চিন্ত সে। তার নিজের জন্যে সে ভাবে না—যা আছে অদৃষ্টে হোক।

কিন্তু সেই সামান্য অবসরটুকুও মিলল না।

তার আগেই, সেই গাঢ অন্ধকারের মধ্যে জমাট বাঁধা গাঢ়তর অন্ধকারের মতো—মসীকৃষ্ণ দৈত্যের মতো কতকগুলো কি প্রাণী ঝাঁপিয়ে পড়ল—একেবারে তাদের ওপর।

॥ ১১ ॥

পরের দিন সকালবেলাই শাহ্জাদা দারার কয়েকজন প্রহরী একটা মৃতদেহ কাপড়ে জড়িয়ে এনে শাহ্জাদা আওরংজেবের সামনে নামাল। ওদের সঙ্গে এসেছিল উচ্চশ্রেণীর ভৃত্য একজন, সে সসম্মানে একটা খৎ ধরল ওঁর সামনে।

আওরঙ্গজেব জানেন, এমনিই একটা অনুমান করেছিলেন তিনিও—যখন ভোরে উঠে শুনেছেন যে দেলওয়ার কাল রাত দ্বিতীয় প্রহরের আগে কোথায় বেরিয়ে গেছে, এখনও ফেরে নি। তার পরিণাম কি হয়েছে সঠিক না জানলেও ভাল যে কিছু হয় নি—তা বুঝতে পেরেছেন সঙ্গে সঙ্গেই। ফজরের নমাজ করার সময় যেখানেই থাক, কাছাকাছি এসে দাঁড়ায় সে, এ তার নিত্যকার অভ্যাস।

শাহ্জাদা কতকটা যন্ত্রচালিতের মতো খাস মুন্সীকে ইঙ্গিত করলেন খৎখানা নিতে।

চিঠি লিখেছেন বড়ে শাহ্জাদার মীর মুন্সী।

লিখেছেন যে, কাল রাত্রে বড়ে শাহ্জাদার বাগানের পাঁচিল টপ্কে এক চোর নেমেছিল। চুরি কি অপর কোন মতলব ছিল তা তাঁরা জানেন না, তবে নিঃশব্দে পাঁচিল টপকে মধ্য রাত্রে যে পরের বাড়ি ঢোকে, তাকে চোরই বলা উচিত। সম্ভবত প্রাসাদের কারও সঙ্গে ষড়যন্ত্র ছিল তার। ইদানিং এই শ্রেণীর চোরের উপদ্রব বেড়ে যাওয়ায় শাহ্জাদা তাঁর শিক্ষিত শিকারী কুকুরদের বাগানে ছেড়ে

রাখার ব্যবস্থা করেছেন। ওঁদের সান্ত্রী প্রহরী বা কোন নৌকর এসে পড়ার আগেই কুকুরগুলো তাদের ওপর গিয়ে পড়েছে। ঐ চোর ছাড়াও একটি স্ত্রীলোক ছিল, সে প্রাসাদেরই কোন বাঁদী। সম্ভবতঃ তার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছিল, বা তার সাহায্যে চুরি করার উদ্দেশ্য ছিল। ভৃত্য বা প্রহরীরা গিয়ে কুকুরগুলোকে ধরবার আগেই তারা দুজনের দেহ খণ্ড খণ্ড ক'রে দিয়েছে, কেউই বেঁচে নেই ততক্ষণ।···চোরের দেহ ওঁরা বাইরেই ফেলে দিতেন—কিন্তু শাহ্‌জাদা দারার কোন কোন ভৃত্য চোরের পোশাক এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখে সন্দেহ প্রকাশ করেছে যে চোর শাহ্‌জাদা আওরঙ্গ-জেবের কোন বান্দা। একদিন তাকে নাকি শাহ্‌জাদার সঙ্গে এ বাড়িতেও আসতে দেখেছে তারা। শাহ্‌জাদা দারা অবশ্যই বিশ্বাস করেন নি কথাটা, তবু কথাটা যখন উঠেছেই—তখন একবার তাঁর প্রিয়তম ভাইয়ের কাছে দেহটা পাঠানোই কর্তব্য মনে করেছেন। যদি এ লাশ সত্যিই তাঁর কোন বান্দা বা পরিচিত কারও হয়—শাহ্‌জাদা স্বচ্ছন্দে ইচ্ছা মতো যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে পারেন। আর সেক্ষেত্রে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া বড়ে শাহ্‌জাদার অন্য কোন কৈফিয়ৎও দেবার নেই। কারণ যা হয়েছে তা দৈবক্রমেই ঘটেছে, বড়ে শাহ্‌জাদার অজ্ঞাতসারেই। সাধারণ তস্করের জন্য যে ব্যবস্থা রাখা উচিত তাই রেখেছিলেন তিনি।······পরিশেষে শাহ্‌জাদা দারা শুকো যে তাঁর ভাইয়ের জন্য নিত্য পরমেশ্বরের কাছে দোয়া ভিক্ষা করেন--সেই প্রয়োজনীয় সংবাদটি দিয়ে পত্র শেষ করেছেন দারার মীরমুন্সী।···

বাহকদের মধ্যেই কে যেন কী ইঙ্গিত করল, আর একজন শবদেহের আবরণ-বস্ত্র সরিয়ে অনাবরিত ক'রে দিল। আওরঙ্গজেব অবিচলিত স্থির দৃষ্টি মেলে দেখলেন। এ দেহ চেনবার কোন উপায় নেই, মুখ থেকেও খানিকটা মাংস খুব্‌লে নিয়েছে। দেহের বেশির ভাগ স্থানেই সাদা হাড় বেরিয়ে গেছে। কতকগুলো রক্তাক্ত মাংসের

টুকরোও এর সঙ্গে জড়ানো—সবগুলো এই দেহেরই কিনা বোঝা সম্ভব নয়। সবগুলো হয়ত নেইও, খেয়েও ফেলেছে ক্ষুধার্ত সারমেয়র দল। যেখানে যেখানে এখনও মাংস আছে শরীরে, সেখানগুলোও রক্তে মাখা। এ থেকে সনাক্ত করার কোন সঙ্গত কারণ নেই, পোশাকেও এমন কোন চিহ্ন নেই, যাতে চেনা যায়। তার মানে ওকে অক্ষত দেহেই দেখেছে কেউ কেউ—কুকুর ছাড়া হয়েছে তার পরে। দারা হয়ত আশাই করেছিলেন, এ বাড়ি থেকে কোন লোক যাবে—তার জন্যে বিস্তৃত আয়োজন ক'রে রেখেছিলেন।

অবিচলিত ভাবলেশহীন মুখে লাশটা একবার দেখে নিয়ে ঘাড় নাড়লেন আওরঙ্গজেব, 'না, এ আমার কোন বান্দা কি নৌকর নয়। আমি চিনি না একে। এ লাশ তোমরা নিয়ে যাও, শাহ্‌জাদা যা ভাল বোঝেন সেই মতোই ব্যবস্থা করবেন তিনি। তিনি যে এতটা বিবেচনা ক'রে আমার কাছে পাঠিয়েছেন—এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। তাঁর এ মেহেরবানী ও সহৃদয়তার কথা ইয়াদ থাকবে আমার।'

তারপর নিজের মীর-ই-বকাউলকে আদেশ দিলেন, 'বড়ে শাহ্‌জাদার লোক এরা, কিছু কিছু বকশিশ দিতে ভুল না হয়। একটু ক'রে শরবৎ আর কিছু মিঠাইও খাইয়ে দিও এদের—এই গরমে এতটা পথ লাশ বয়ে এনেছে—'

আর কোন প্রশ্ন করলেন না তিনি, কোনও ঔৎসুক্য প্রকাশ করলেন না। মনোভাব গোপন করার শিক্ষা তাঁর বংশে সহজাত, কিন্তু শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজেব কঠোর অভ্যাসে মনটাকে সুদ্ধ নির্বিকার ক'রে তুলতে পেরেছেন। অকারণ কৌতূহল নেই তাঁর। যে খবর দিতে গিয়েছিল তার এ দুর্গতি দেখে যাকে খবর দিতে গিয়েছিল—সেই কাশ্মীরীবাই সম্বন্ধে একটা আশঙ্কা ও ঔৎসুক্য স্বাভাবিক—কিন্তু বোধকরি তাও অনুভব করলেন না তিনি। যদি সেখানেও বিপদ কিছু হয়েই থাকে—তিনি কোন প্রতিকার করতে পারবেন না। আর যদি বেঁচে থাকে তো একদিন তাকে সেখান থেকে উদ্ধার

ক'রে আনবেনই—এ সংকল্প বহু পূর্বেই নেওয়া হয়ে গেছে। সুতরাং ও প্রশ্নের ঐখানেই শেষ। তার জন্য বিচলিত হবার প্রয়োজন নেই।···

স্থির অবিচল মুখেই নিজের মুন্সীখানায় এসে ঢুকলেন তিনি। এই ঘরে দেলওয়ারের অসংখ্য স্মৃতি—কালও অনুনয়-বিনয় ক'রে তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দেবার অনুমতি আদায় করেছিল। এই শ্রেণীর ব্যক্তিগত আরামে চিরদিনের বিতৃষ্ণা শাহ্‌জাদার—ছেলেটার তেমনি লোভ সেবা করার।

কিন্তু তবু, এ ঘরে এসেও শাহ্‌জাদার চোখে জল এল না। বরং নির্জন নিভৃতে এসে দুই চোখে আগুনই জ্বলে উঠল। মাটির দিকে চেয়ে অস্ফুট, প্রায় অশ্রুত স্বরে বললেন, 'ভুল করলে, বড়ই ভুল করলে শাহ্‌জাদা দারা। অন্যায় করেছিল ঠিকই—তা বলে এতটা না করলেও পারতে।······তাকে কায়েদ ক'রে পায়ে বেড়ি পরিয়ে আমার কাছে পাঠালে আরও বেশী শোধ উঠত তোমার। ঢের বেশী সাজা হ'ত, তারও—আমারও। আমাকে অপদস্থ করার এমন সুযোগ তুমি হাতে পেয়েও ছেড়ে দিলে।······নির্বোধ তুমি, একটা অবোধ বালকের রক্তের ঋণ মাথায় চাপিয়ে দিলে আমার! আর কোন বিবেচনার কারণ রইল না।—যেটুকু দ্বিধা ছিল, তুমিই তা কাটিয়ে দিলে। একই সঙ্গে শাহী তখ্‌ৎ, নিজের জিন্দিগী আর তোমার ছেলেদের তক্‌দির—এক বাজীতে হেরে বসে রইলে। এই প্রতিটি বিন্দু রক্তের কিম্মৎ তোমাকে ওয়াশিল দিতে হবে—তোমার রক্তে—তোমার উত্তর পুরুষদের রক্তে। তুমি কি করলে হতভাগ্য শাহ্‌জাদা, এ কী করলে!'

চোখের সে বহ্নি কখন অন্তরের বাষ্প আকর্ষণ ক'রে মেঘের সৃষ্টি করেছিল, দৃষ্টি আচ্ছন্ন ক'রে দিয়েছিল, তা আওরঙ্গজেব নিজেও টের পান নি। এক ফোঁটা গরম জল গালে গড়িয়ে পড়তে চমক ভাঙ্গল তাঁর। হৃদয়াবেগের এই পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ায় জনহীন ঘরেও

যেন লজ্জা বোধ করলেন—তাড়াতাড়ি রুমালে তার চিহ্ন পর্যন্ত মুছে নিয়ে শান্তভাবে একখানা কাগজ আর দোয়াত কলম টেনে নিয়ে যেন চিঠি লিখতে বসে গেলেন তখনই।

শুধু, দেলওয়ার থাকলে লক্ষ্য করত, কপালের দু পাশে রগের কাছে দুটো জায়গা তখনও মধ্যে মধ্যে ফুলে উঠছে একবার ক'রে—দৃঢ় কোন সঙ্কল্পের বহিপ্র্কাশ হিসেবে।

—শেষ—